ঘোড়া কিনলেন
পরাশর বর্মা
Classification
Code : 4·4 4.4
Serial No. 44
(Ghora Kinlen Parasar
Barma)
663
প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘোড়া কিনলেন পরাশর বর্মা ঘুড়িও ওড়ালেন

হর্ষবর্ধনের নানারঙ্গ
শিব্রাম চক্রবর্তি

ভদ্রলোক চোর
তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

ঘোড়া কিনলেন পরাশর বর্মা
ঘুড়িও ওড়ালেন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
কলিকাতা : নিউ দিল্লী

মূল্য: সাড়ে চার টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী:
শ্রীজয়ন্ত চ্যাটার্জী

৫এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০০৭৩
শান্তিমোহন হাউস, ১৬-আই/১ আনসারি রোড, দিল্লী-১১০০০২

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ৫এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩-এর পক্ষে শ্রীবিমল কুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং অজন্তা প্রিন্টার্স, ৪/২ রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা-৯-এর পক্ষে শ্রীতপনকুমার বারিক কর্তৃক মুদ্রিত।

ঘুড়ি ওড়ালেন পরাশর বর্মা

॥ এক ॥
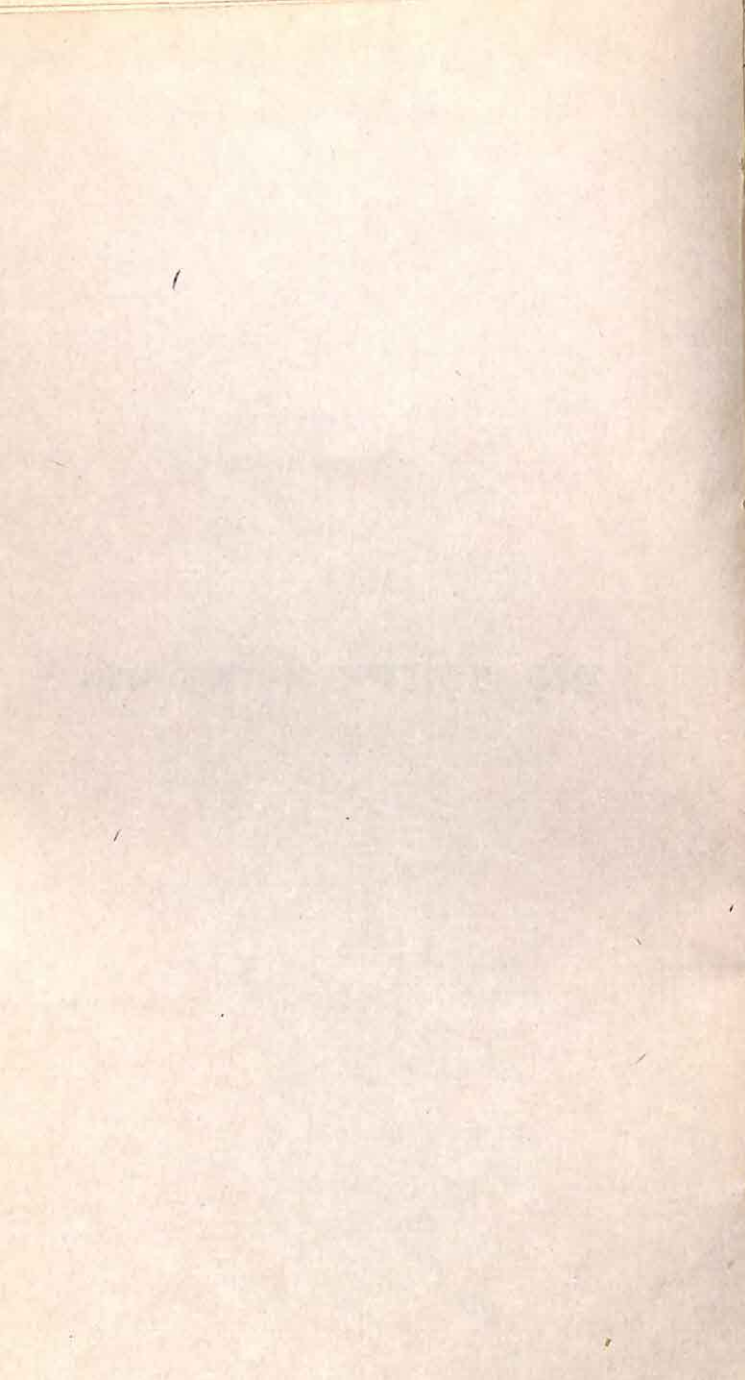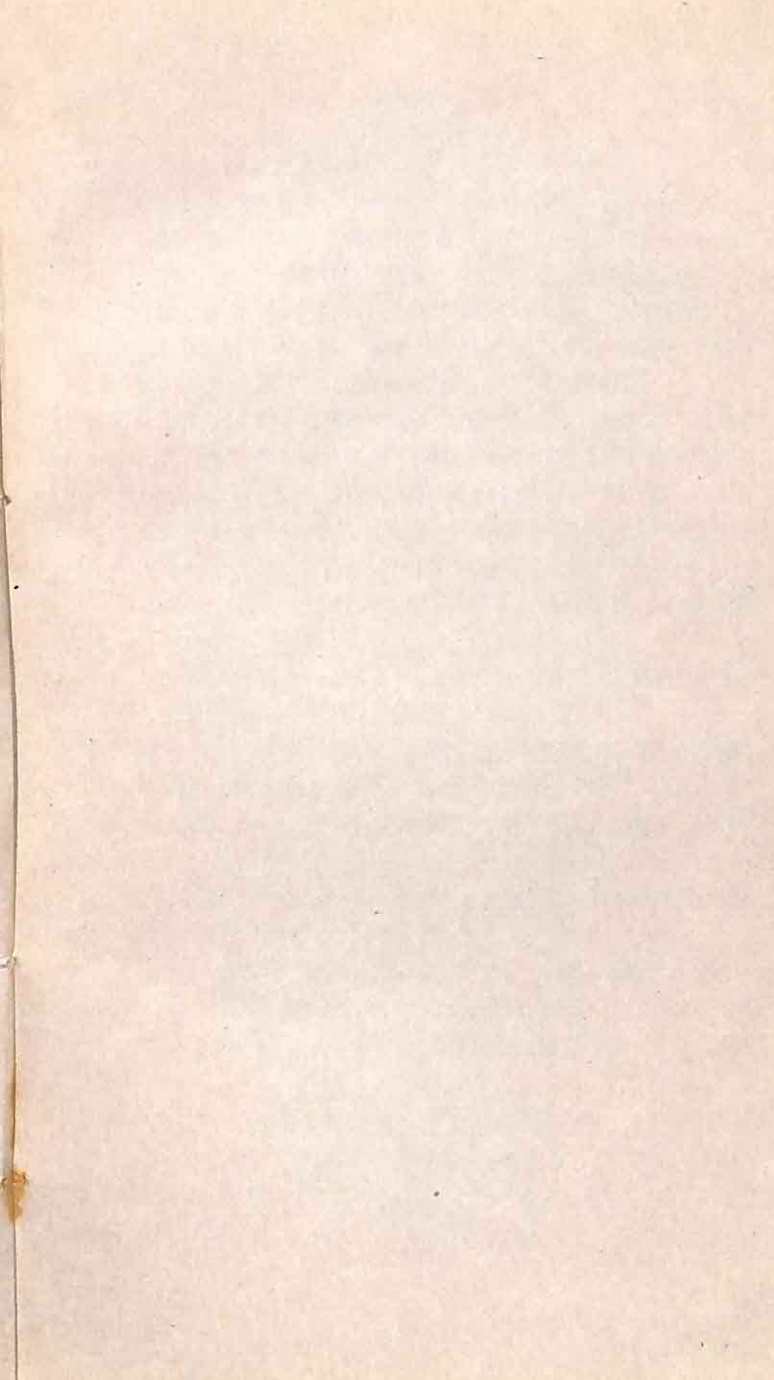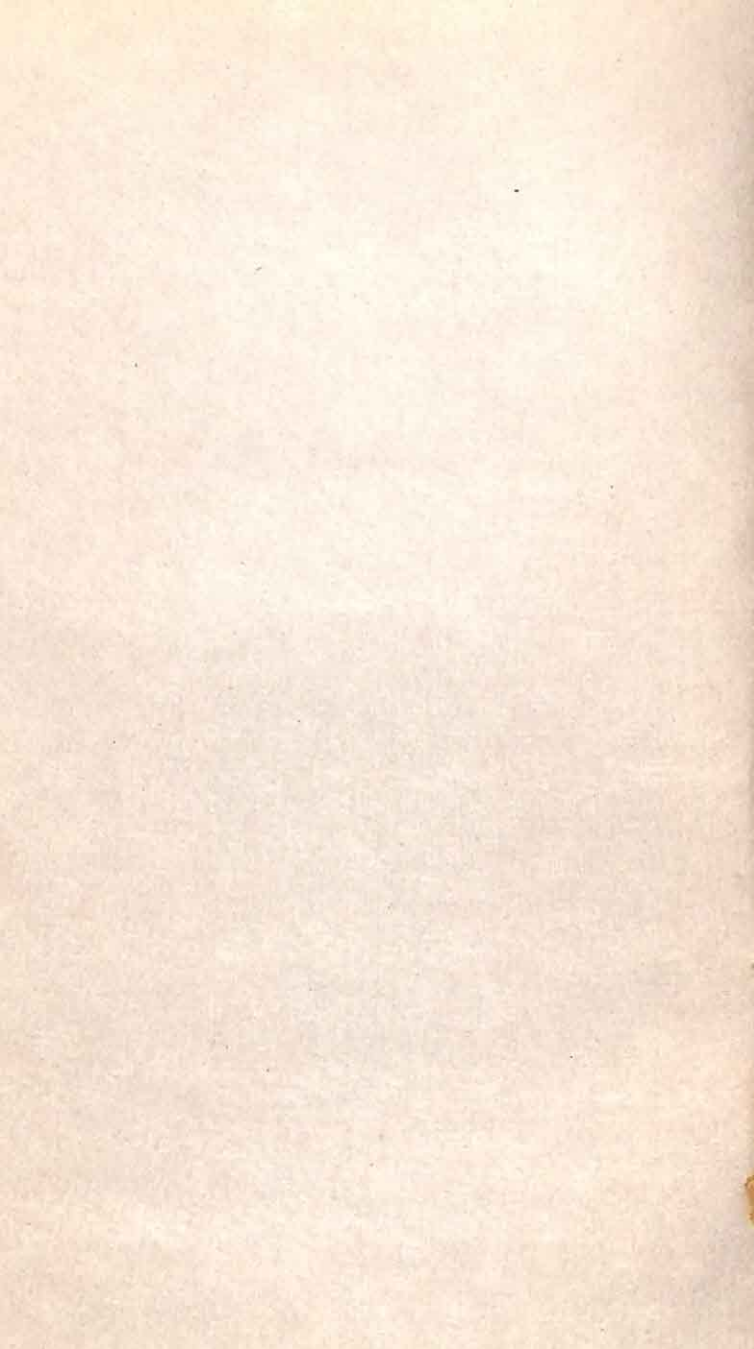
এক সময়ে আফশোষ হয়।

হ্যাঁ সত্যিই আফশোষ হয় পরাশরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বলে।

পরাশরের সঙ্গে আমি অবশ্য নিজে থেকে যেচে আলাপ করতে যাইনি। সে নিজেই এসেছিল তার কবিতার বাতিকের ঠেলায়।

সেদিন সে অবশ্য শুধু একটা ব্লটিং প্যাড দেখে আমার প্রেসের মস্ত বড় একটা রহস্যের সমাধান করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করতে যাওয়াটা আমারই অপরাধ!

বন্ধু সুরেশ্বরবাবুর ডাক বাক্সের সেই তিনটি রহস্যময় চিঠির সমস্যা নিয়ে তখন যদি অত খুঁজে পেতে খিদিরপুরের একটা বাড়িতে না যাই, তাহলে পরাশরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই আর হয় না।

কুমতি ক্লাবের কথা অবশ্য তাহলে অজানাই থাকে আর পরাশরের অনেক কীর্তির সঙ্গে নিজে জড়িয়ে পড়ি না, কিন্তু তাতেও খুব লোকসান কি হয়? সুখের চেয়ে সোয়াস্তি যে অনেক ভাল, সে কথা কি মিথ্যে?

হঠাৎ মেজাজ এমন বেগড়াল কেন, এবং কি নিয়ে, তা অবশ্য সবাই জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তা মেজাজ বেগড়াবে না!

পরাশরের সঙ্গে বুনো হাঁসের পিছনে অনেকবারই ছুটতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে হয়তো প্রত্যেকবারই ঘোড়ার চালে কিস্তিমাতের কেরামতি দেখিয়েছে। কিন্তু ধকলটা পুরোপুরি সইতে হয়েছে আমাকেই।

যত আজগুবি ধান্দায় এ পর্যন্ত সে আমায় টেনে নিয়ে গেছে তার মধ্যে এবারেরটিই কিন্তু একেবারে মোক্ষম।

ধারে কাছে কোথাও হলে তো বুঝতাম। এমন জায়গায় যেতে হয়েছে যার নাম পর্যন্ত এর আগে কখনো শুনিনি। আমাদের এই উত্তর ভারতের ক'জনই বা নেহাত টাইম টেব্‌লের পোকা না হলে সে নাম জানে।

একেবারে নিতান্ত হেলাফেলার ছোট-খাট স্টেশন নয়। ভিকারাবাদ জংশন। তবু জানা না থাকলে সমস্ত অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে গাইড তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ নাম বার করা সহজ হত না। আর কোথায় সে স্টেশন?

কলকাতা থেকে যাওয়াই একটা জটিল ব্যাপার। প্রথম হাওড়া থেকে দুপুর বারোটায় চড়তে হয়েছে হাওড়া হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেসে। নামে এক্সপ্রেস। গদাই লস্করি চালে পুরো প্রায় দুটি দিন গর্ভযন্ত্রণা দিয়ে সে ট্রেন সকাল সাতটায় গিয়ে পৌঁছেছে সেকেন্দ্রাবাদে। পৌঁছবার কথা আরো ঘণ্টাখানেক আগে। তবে মাত্র এক ঘণ্টা যে লেট করেছেন সেই ভাগ্যি।

ট্রেন থামতে না থামতে নিজেরাই হোল্ড-অল সুটকেশ ঘাড়ে করে ছুটতে হয়েছে আরেক প্যাসেঞ্জার ধরবার জন্যে। সে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আমাদের জন্যে মিনিট দশেক ছাড়তে দেরী করেছেন বলে কোনরকমে মালপত্রগুলো তুলে পড়ি-কি-মরি করে তাতে উঠতে পেরেছি। এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এখনো অন্তত সওয়া তিনটি ঘণ্টা আমাদের কাটাতে হবে। তারপর দেখা পাব ভিকারাবাদ জংশনের।

এই ভিকারাবাদ জংশনে যাবার জন্যেই তিনদিন ধরে এত হয়রানি। মাথায় পোকাটা নড়ে ওঠবার পর পরাশর আমায় এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেয়নি। বৃহস্পতিবার রাত বারোটার সময় তার ফোন পেয়ে প্রথম ব্যাপারটা ঠাট্টাই ভেবেছিলাম। বারোটা বেজে তখন মিনিট দুয়েক হবে।

রিং শুনে শোবার ঘর থেকে উঠে এসে ফোনটা ধরতে হয়েছে বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গেই। রং নম্বর বলেই তখন ধরে নিয়েছি। কি রকম তেতে জবাবটা দেব মনে মনে তাও ভাবছি।

কিন্তু রং নম্বর নয়। ঠিক ডাকই এসছে।

কৃত্তিবাস? ঘুমোচ্ছিলে বুঝি! হ্যাঁ, ভাল করে ঘুমিয়ে নাও। কাল দুপুরেই রওনা হতে হবে। বেশী কিছু নয়, দিন সাতেকের মত যা লাগে নিও। টিকিট আমি করে রেখেছি।

একটানা এই বিজ্ঞপ্তির মধ্যে জবাবে কিছু বলবার মত এতটুকু ফাঁক পরাশর রাখেনি। তার ভাষণ শেষ হবার পর তাই একটু হেসে বলেছি, ঠিক আছে। আমিও বাক্স প্যাঁটরা বেঁধে প্রস্তুত। তবে শীতের পোশাক নেব না গরমের তাই শুধু ভাবছি। পুরি যাচ্ছ না দার্জিলিং!

না না, পুরি দার্জিলিং নয়, পরাশর নেহাৎ ঠান্ডা গলাতেই জানিয়েছে, যাচ্ছি ভিকারাবাদ। যেতেই প্রায় দুদিন লাগবে।

কোথায় যাচ্ছ? এবার গলাটা আপনা থেকে চড়া হয়ে উঠেছে,—

কি বললে? ভিকারাবাদ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিকারাবাদ! ভিকারাবাদ জংশন। যাক, সে তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি শুধু দশটার আগে তৈরি থেকো। আমি ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে তোমায় তুলে নেব।

এরপর পরাশরের ওদিকে ফোন নামিয়ে রাখবার শব্দ।

মেজাজটা তখন কি হয়েছে তা বোধহয় বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

পর পর অন্তত পাঁচবার পরাশরের নম্বর ডায়াল করেছি। একবার তাকে ফোনে পেলে যা বলব তখন ঠিক করেছি, তার জ্বালায় রিসিভারই হয়তো চিড় খাবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হল কই!

পরাশর তার রিসিভার নামিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু ক্রেডলেই বোধহয় নয়। বার বার চেষ্টা করেও কানেক্ট করতে পারলাম না।

তা সত্ত্বেও সকালবেলা ঠিক সময়েই তৈরি হয়ে থেকে তার আনা ট্যাক্সিতে উঠে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনটা ধরলাম কেন!

সেইখানেই তো গলদ। পরাশরের কিছু সম্মোহন মন্তর-টন্তর জানা আছে নিশ্চয়। যতই ফোঁস-ফোঁসাই শেষ পর্যন্ত তার কথা ঠেলতে পারিনি। অন্তত এখনো নয়।

ট্রেনে উঠে বসবার পর আমাদের এই আজগুবী অভিযানের কারণটা শোনবার পর কিন্তু সত্যিই তখুনি চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে নেমে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল। বলে কি পরাশর? সত্যিই ক্ষেপে গেছে নাকি?

সেই দুদিনের রাস্তা ভিকারাবাদ জংশন আমরা যাচ্ছি কি কারণে তা সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ বুঝি ভাবতেও পারবে না।

যাচ্ছি জাতিস্মর একজনের খোঁজে!

পরাশরের মুখে কথাটা শুনে খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে তার দিকে চেয়েছিলাম। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। দিনের বেলা হলেও আমাদের ক্যুপেটায় আর কেউ ওঠেনি। পরাশর সারা দিন রাত্রের জন্যেই সেটা রিজার্ভ করেছে।

কামরায় আর কেউ থাকলে আমার মুখের চেহারাটা তার নিশ্চয় নজর এড়াত না। বিস্ময় বিমূঢ়তার সঙ্গে সেখানে বেশ তীব্র একটা ক্ষোভও ফুটে উঠেছিল। এমনি একটা অজগুবী ধান্দায় জরুরী সব কাজ-কর্ম ফেলে পরাশরের সঙ্গে আমায় যেতে হচ্ছে! পরাশরের সত্যিই কোন কাণ্ডজ্ঞান কি নেই?

কিন্তু এই নিয়ে রাগারাগি করে তো লাভ নেই। সত্যিই চেন টেনে

নেমে যেতে তো পারব না। নিজেকে সামলে তাই যথাসম্ভব শান্ত গলাতেই জিজ্ঞাসা করেছি, জাতিস্মরটি কে? আর তার খোঁজে ওই অতদূর যাওয়া!

জাতিস্মর তো আমার সুবিধামত আমার বাড়ির পাশে জন্মায় না। পরাশর হেসে বলেছে, যেখান থেকে তার খবর আসে সেখানেই তাই যেতে হয়।

কিন্তু এ খবর তোমার কাছে এল কি করে? একটু সন্দিগ্ধ ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছি, জাতিস্মর খোঁজবার জন্যে তোমার কি চর লাগানো আছে নাকি?

চর লাগানো থাকবে কেন? পরাশর বলেছে, খবরের কাগজ থেকেই যা জানবার জেনেছি।

খবরের কাগজ! রীতিমত অবাক হতে হয়েছে এবার—খবরের কাগজে এ খবর বেরিয়েছে! আমরা কি খবরের কাগজ পড়ি না!

আহা, এখানকার কাগজ তো নয়! পরাশর আমায় বুঝিয়েছে, ওদিকের একটা উর্দু কাগজ, তাও দৈনিক নয় সাপ্তাহিক। গুলবর্গা থেকে বার হয়।

সেই উর্দু কাগজ তুমি পড়েছ? আর তার খবরেই বিশ্বাস করে আমাকে শুদ্ধ সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছ? সন্দেহটা গলায় স্পষ্ট করে তুলেই জিজ্ঞাসা করেছি, এ কাগজ তুমি পেলে কোথায়? আর পড়লেই বা কি করে? তুমি উর্দু জানো তা তো জানতাম না।

জানি মানে তাকে কি সত্যিকার জানা বলে! পরাশর বিনয় দেখিয়েছে, তবে কোনরকমে অক্ষর-টক্ষরগুলো পড়তে পারি।

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু এ কাগজ তোমার হাতে এল কি করে?

পরাশর এবার খানিকক্ষণ চুপ। তখন ট্রেন খড়গপুর ছাড়িয়ে এসেছে। বর্ষাকালেই রওনা হয়েছি। হঠাৎ বৃষ্টির ছাট আসায় জানালা বন্ধ করতে ওঠার ছুতোয় আমার প্রশ্নের জবাবটা সে এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। পরাশর জানালা বন্ধ করে ফিরে আসবার আগেই আবার প্রশ্ন করেছি, কই! এ উর্দু কাগজ তোমার কাছে কি করে এল বলছ না কেন?

বলছি না মানে, পরাশর আবার ভেতরের সীটে এসে বসে একটু গড়িমসি করে বলেছে, মানে, সে কথা আর শুনে কি হবে? কোন

রকমে এসেছে এইটেই ধরে নাও না।

না, তা ধরে নিতে যাব কেন? আমি কড়া হয়েছি এবার, কাগজটা কি করে তোমার কাছে এসেছে তা বলতে বাধা কি?

বাধা এই যে, পরাশর আমার দিকে চেয়ে একটু যেন কিন্তু হয়ে বলেছে, শুনলে তুমি রাগ করবে!

শুনলে আমি রাগ করব! আমি সত্যিই তাজ্জব, তোমার কাছে কি করে কোন ধাপ-ধাড়া গোবিন্দপুর মুলুকের একটা উর্দু কাগজ এসেছে তা জানলে আমার রাগ হবে কেন?

মানে—পরাশর তখনো একটু দ্বিধাগ্রস্ত, কাগজটা তো ঠিক আসেনি। ওই খবর যে পাতায় বেরিয়েছে সেই পাতাটা কেউ কেটে ওই খবরটা দাগ দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে।

আর তুমি সেই উড়ো খবরের ওপর নির্ভর করে...। হতাশার সঙ্গেই এবার বলেছি, না তুমি সত্যিই সব বিচারের বাইরে।

রাগ করলে তো! পরাশর অপরাধীর মত আমার দিকে তাকিয়েছে।

তা রাগ করা কি খুব অন্যায়! আমি ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছি, কোথাকার কার পাঠানো একটা চোঁতা কাগজের খবরের কাটিং পেয়ে তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি কাণ্ড-জ্ঞান সব লোপ পেয়ে গেছে! যাক, এখন আর রাগারাগি করে কোন লাভ তো নেই। খবরটা কি তাই একটু বুঝিয়ে বল শুনি।

॥ দুই ॥

শুক্রবার দুপুরে রওনা হয়ে দু'দিন বাদে আবার সেই দুপুরবেলায় ভিকারাবাদ জংশনে পৌঁছনোর মধ্যে পরাশরের কাছে ব্যাপারটা সম্বন্ধে যতখানি সম্ভব জেনে নিয়েছি। পরাশরের কাছে কিছু জানা অবশ্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। সহজে সে কি কিছু বলতে চায়। প্রায় আখের মত চাপ দিয়ে নিংড়ে তার কাছ থেকে কথা বার করতে হয়েছে।

যা জেনেছি তাতে পরাশরের নির্বুদ্ধিতা আর খামখেয়ালিটাই অবাক করেছে। নগণ্য উর্দু একটা সাপ্তাহিকের যে খবরটা পরাশরের কাছে কাটা কাগজের টুকরোয় পৌঁছোয় নেহাৎ আহাম্মক না হলে কেউ তার কোন গুরুত্ব বোধহয় দেয় না।

খবরটা এই যে ভিকারাবাদ শহরের একটি মেয়ের মধ্যে হঠাৎ অদ্ভুত একটা ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। যদিও তার মাতৃভাষা উর্দু, তবু মেয়েটি নাকি তেলেগু তামিল মারাঠিতে শুধু নয়, হিন্দি ইংরেজিতেও গড়গড় করে কথা বলতে পারে। এছাড়া তার আরেকটি অদ্ভুত ক্ষমতা হল পূর্বজন্মের সব কথা স্মরণ করতে পারা। এক জন্ম নয়, এর আগের দু-তিন জন্মের কথা সে নাকি সবিস্তারে বলে যাচ্ছে।

এ খবরটুকু পড়লে প্রথমেই সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তা না হয়ে পরাশর অন্ধ বিশ্বাসে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভক্তের মতই সেখানে ছুটে চলেছে।

ট্রেনে আসতে আসতে তার মনের এই মূঢ়তার ঘোর কাটাবার চেষ্টা করিনি তা নয়। বলেছি, তুমি সত্যি এই খবর বিশ্বাস কর! সত্যি জাতিস্মর বলে কিছু আছে বলে তোমার ধারণা!

বাঃ. জাতিস্মর নেই! পরাশর এইবারই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারপর প্যারাসাইকলজির জয়গান করে তা থেকে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলেছে, এসব তুমি গাঁজাখুরি মনে কর? জন্মান্তর কি সত্যি হয় না?

হয়তো হয়। হাল ছেড়ে দিয়ে এবার বলেছি, কিন্তু জন্মান্তরবাদ আর প্যারাসাইকলজিতে তোমার টান কবে থেকে হল? আগে তো কখনো দেখিনি।

আগে না হলে আর পরে হতে নেই? বলে এক কথায় পরাশর আমায় থামিয়ে দিয়েছে। বাতুলকে সুবুদ্ধি দেওয়ার চেষ্টা বৃথা বলে আমিও চুপ করে গেছি।

ভিকারাবাদ নেমে প্রথম একটি হোটেলের সন্ধান করতে হল। কিন্তু ওই অখদ্দে শহরে হোটেল বলতে যা বুঝি তা কোথায়?

শেষ পর্যন্ত স্টেশনের ওয়েটিংরুমই আশ্রয় করে স্নান-টান আর সামান্য কিছু খাওয়া-দাওয়া সেরে লেফ্‌ট লাগেজে মাল রেখে শহরে উর্দু কাগজে দেওয়া ঠিকানা খুঁজতে বার হলাম।

খোঁজার জন্য বেশী কেন, কোনরকম হাঙ্গামাই পোহাতে হল না। কাগজে ঠিকানা দেওয়া ছিল সুরজমহল্লার। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে টাঙ্গায় উঠে সুরজমহল্লার নাম করতেই টাঙ্গাওয়ালা একগাল হেসে

বললে, জানতে হ্যায় হুজুর!

জানতে হ্যায় কি? পুরো ঠিকানা না বলতেই টাঙ্গাওয়ালা জানল কি করে? পরাশর সেই কথাই বলতে গেল। বললে, আরে শুধু সুরজমহল্লা শুনেই জেনে গেলে! সুরজমহল্লার মোকান কি একটাই, কোথায় যাচ্ছি তা তো এখনো বলিনি!

বলার জরুরৎ নেই মালিক! টাঙ্গাওয়ালা তখন চাবুকের আওয়াজ করে তার বাহনকে চালু করে দিয়েছে—মতিকোঠিতে যাবেন তা কি আর জানি না।

তুমি জানো! পরাশরের চেয়ে আমিই এবার বেশী অবাক হলাম। এ শহরে এক জাতিস্মরের খবর জানা গেছে। সেই সঙ্গে এখানকার টাঙ্গাওয়ালারাও অন্তর্যামী নাকি? সোজাসুজিই এবার টাঙ্গা-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মতিকোঠিতেই যে যেতে চাই তা তুমি জানলে কি করে?

নতুন আমদানি বহু সওয়ারীই ওই ঠিকানায় যেতে চায় বলে, কেমন?

জবাবটা এবার টাঙ্গাওয়ালার বদলে পরাশরের। টাঙ্গাওয়ালাও তাতে সায় দেওয়াতে রহস্যটা পরিষ্কার হল। টাঙ্গাওয়ালার কথাতেই জানা গেল গত কয়েকদিন ধরে এ স্টেশনে নেমে অনেক যাত্রীই সুরজমহল্লার ওই মোতিকোঠিতে যেতে চাচ্ছে। ঠিকানাটা তাই তার জানা হয়ে গেছে। কেন যে এত লোক ওখানে যাচ্ছে তাও টাঙ্গা-ওয়ালার অজানা নয়।

কেন যেতে চায় তা জানো! পরাশরই প্রশ্ন করলে এরপর।

হাঁ মালিক। টাঙ্গাওয়ালা বেশ একটু গর্বভাবে জানালে, ভিকারা-বাদের মানুষ হয়ে এ কথাটা জানবে না। সারা শহরে কে না জানে এ কথা!

আচ্ছা, কি জানো ঠিক করে বল তো! আমি এবার জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না।

লোকটা তার ছিপটি নাড়তে নাড়তেই মুখ ফিরিয়ে একবার আমায় যেন একটু সন্দিগ্ধ ভাবে দেখে বললে, আপনাকে আর আমি কি বলব হুজুর! কোথা থেকে এত কষ্ট করে আপনারা, কি কিছু না জেনে এখানে এসেছেন!

টাঙগাওয়ালাকে এরপর আর কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত বলে মনে হল না।

জিজ্ঞাসা করলেও সুরজমহল্লার মতিকোঠিতে গিয়ে যা দেখে আমি অন্তত সত্যিই অপ্রত্যাশিত একটা চমক পেলাম তা সে বলতে পারত কিনা সন্দেহ।

পরাশরের কাছে এত সব শুনে-টুনে এসেও মতিকোঠিতে জাতিস্মর বলে দাবী করা মেয়েটিকে দেখবার পর সত্যিই রীতিমত চমকে উঠেছিলাম।

ভিকারাবাদ স্টেশনে নামবার পর যা মনে হয়েছিল সুরজমহল্লায় পেঁাছে সে অবজ্ঞার ভাবটা আর থাকেনি। সত্যিই বেশ পরিচ্ছন্ন খানদানি পাড়া। বাড়িগুলি সবই একটু মুসলিম স্থাপত্যের প্রভাবে তৈরি। পুরানো হলেও তাই তার আর একটা আলাদা মহিমা আছে।

এরই মধ্যে মতিকোঠিটি একটু দুখিনী গোছের। দেখলে মনে হয় এ মহল্লার পত্তন হবার সময়ে প্রথমেই বোধহয় এটি তৈরি হয়েছিল। তারপর খুব সুদিন তার যায়নি একটুও, তাই এখন ভগ্নদশা।

বাড়িটি মহল্লার তুলনায় যেমনি হোক, ভেতরে গিয়ে বসবার পর প্রাথমিক লৌকিকতা সারা হলে যা দেখলাম তা চমকে দেওয়া শুধু নয়, একেবারে হতভম্ব করবার মত।

যে ঘরটিতে বসেছিলাম তার সৌভাগ্যের দিন অনেক আগেই গত হয়েছে। মেঝের কার্পেট ছেঁড়া ও ময়লা। গালিচা একটা যা পাতা আছে তা জীর্ণ বিবর্ণ, মখমলের তাকিয়া আছে ঠিকই কিন্তু তা দেখলে তার ওপর হেলান দিতে উৎসাহ হয় না। বড় চৌকির ওপর পাতা ফরাসটা ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার। তার ওপর আমি অন্তত একটু আড়ষ্ট হয়েই বসেছিলাম। পরাশরের অবস্থাও আমার চেয়ে খুব স্বাচ্ছন্দ্যের বোধহয় নয়।

তবে অস্বস্তিটা লুকোবার জন্যে সে ঘরের এদিক ওদিক খুব যেন খুঁটিয়ে দেখবার ভাণ করছিল। ভাণটা অবশ্য বৃথা।

কি আছে ঘরটার দেখবার। পুরানো আমলের বৈঠকখানা ঘর। দেয়ালে ছবি টবি দু-একটা টাঙানো, তা সেই প্রথম কোম্পানি আমলের এদেশী রহিসদের খিচুড়ি ফ্যাশানের। তাতে সস্তা বিলাতি ফক্স হান্‌টিং-এর সওয়ার আর কুকুরের পালের ছবি রাফায়েল, মাইকেল

এঞ্জেলোর নাম-করা ছবির কপির সঙ্গে সমান আদরে টাঙানো হয়েছে। সে সব ছবি রং-চটা ভাঙা ফ্রেমের মধ্যে ধুলোয় ময়লায় অস্পষ্ট বলে সবকটিই প্রায় এক বলে মনে হয়।

আড়ষ্টভাবে বসে থাকতে থাকতে মনের মধ্যে উদ্বেগও অনুভব করছিলাম।

আমরা বাইরে এসে দাঁড়াবার পর মাথায় পাগড়ি বাঁধা যে বৃদ্ধ লোকটি আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন তাঁকে আমাদের আগমনের হেতু কিছু বলা হয়নি। তিনি সে সুযোগও দেননি। ক'টা ছোট ধাপ বেয়ে উঠে বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তাঁর দেখা পেয়েছিলাম।

তিনি যেন ভেতর থেকে কি কাজে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াতে পরাশর সবিনয়ে আমাদের পরিচয় ও আসার কারণ জানাতে গেছল। কিন্তু কথা শুরু করতে না করতেই বৃদ্ধ—'আসুন আসুন' বলে একটু আপ্যায়নের হাসি হেসেছিলেন। তারপর এই ঘরে এনে বসিয়ে সেই যে চলে গিয়েছেন এতক্ষণের মধ্যে আর দেখা নেই।

মনের মধ্যে কয়েকটা প্রশ্ন ওঠার জন্যেই উদ্বেগটা হচ্ছিল। প্রথমত, বৃদ্ধ আমাদের কথা ঠিক বুঝেছেন তো? আমরা কলকাতা থেকে আসছি পরাশর তো এর বেশী আর কিছু জানাবার সুযোগই পায়নি।

দ্বিতীয়ত, আমরা ঠিক বাড়িতেই কি এসেছি? এইটিই যে মতি-কোঠি তা কাউকে জিজ্ঞাসা করে আমরা জেনে নিইনি। মতিকোঠি বলে কোন লেখাও বাইরে কোথাও চোখে পড়েনি আমাদের। টাঙ্গা-ওয়ালার কথায় বিশ্বাস করেই আমরা এখানে নেমে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। সে যে আমাদের মত বিদেশী যাত্রী পেয়ে একটু জব্দ করবার রসিকতা করেনি তার ঠিক কি?

তাকে সন্দেহ হবার কারণ যে একেবারে নেই তা নয়। সুরজ-মহল্লা বলতেই বুঝে নিয়েছে ভাণ করে মতিকোঠির নাম করলেও কেন যে জায়গাটা ভিকারাবাদ শহরে হঠাৎ বিখ্যাত তা সে স্পষ্ট করে জানায়নি একবারও, বরং কথাটা এড়িয়েই গেছে কায়দা করে।

এ ছাড়া যে কারণে আমরা এখানে এসেছি তার জন্যে ভিকারাবাদে

মতিকোঠি যদি বিখ্যাতই হয়ে উঠে থাকে তাহলে তার লক্ষণ কি এই?

আমরা ছাড়া আর কোন কৌতূহলী দর্শনপ্রার্থীকে তো দেখছি না।

॥ তিন ॥

মনের মধ্যে এই সব প্রশ্ন তোলপাড় করার মধ্যেই ভেতর মহলে একটা ঘণ্টার শব্দে সচকিত হলাম। ভেতরের মহলে কোথাও কোন পুজো হচ্ছে। সেই পুজোরই ঘণ্টায় টানা শব্দ।

সে শব্দ থামবার পর আমাদের দরজার সামনে দিয়ে নানা বয়সের বেশ কিছু পুরুষ মেয়েকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। তারা বাইরে থেকে পুজো দেখতেই এসেছিল সন্দেহ নেই।

পুজোর ঘণ্টাধ্বনিতে প্রথম চমকটা শুধু শব্দের জন্যেই লাগেনি বুঝলাম। সুরজমহল্লার বাড়ি ঘরগুলির স্থাপত্যের ধরণে মনে যে দাগটা লেগেছিল তার সঙ্গে পুজোর ঘণ্টাটা ঠিক খাপ খায়নি এখন অবশ্য বোঝা গেল যে মহল্লার চেহারাটা যে রকমই হোক মতি-কোঠি বাড়িটা অন্তত হিন্দুর।

ঘণ্টাধ্বনি থামবার পর বাইরের ভক্ত দর্শকরা চলে যাবার পর পাগড়ি পরা বৃদ্ধ এতক্ষণে আবার দেখা দিলেন।

এবার আর একা নয়। সঙ্গে একজন ভৃত্য। ভৃত্যের হাতে একটি বড় পারাত। আর সে পারাতের ওপর দুটি রেকাবীতে ফলমূল মিষ্টি আর দুটি গেলাসে সরবৎ গোছের কোন পানীয়। কাঁচের নয়, গেলাসগুলি পাথরের বলে পানীয়ের স্বরূপটা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

ভৃত্য এসে আমাদের সামনে পারাত থেকে খাবারের রেকাবী ও পানীয়ের গ্লাস নামিয়ে দেবার পর বৃদ্ধ আগের মতই আপ্যায়নের হাসি হেসে বললেন, নিন, একটু পুজোর প্রসাদ খান।

পুজোর প্রসাদ? একটু বিস্ময় প্রকাশ করেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি পুজো?

বৃদ্ধ যে পুজার নাম করলেন আমি অন্তত কখনো তা শুনিনি।

শুনতে ভুল করেছি মনে করে একটু অবিশ্বাসের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা

করলাম, কার পুজো বললেন? দর্পণা দেবীর?

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

কিন্তু এরকম পুজোর কথা বা এ রকম দেবীর নাম তো কখনো শুনিনি!

বিমূঢ়তাটা প্রকাশ করলাম।

না শোনবারই কথা—বৃদ্ধ একটু হাসলেন, এ দেবী দেওয়ানীর একেবারে নিজের। শুধু তার কাছেই উনি দেখা দিয়ে পুজো চেয়েছেন বলে দেওয়ানী একবছর ধরে ওঁর পুজো করে আসছে।

বেশ একটু বিভ্রান্ত হয়ে চুপ করতে বাধ্য হলেও ভুল ঠিকানায় ভুল বাড়িতে যে আসিনি এইটুকু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ধড়ে তখন প্রাণ এসেছে। জাতিস্মরা মেয়েটির নাম যে দেওয়ানী অর্থাৎ দেবযানী তা অন্তত জানা গেল। তার নিজের আবিষ্কার করা দেবীর পুজো একবছর আগে আরম্ভ হয়েছে জেনে তার পূর্বজন্মের কথা স্মরণের ক্ষমতাও সেই থেকে দেখা দিয়েছে অনুমান করা যেতে পারে। এর মধ্যেই নিজে থেকে পুজো করা থেকে মেয়েটির বয়সও কিছুটা আঁচ করা যায়। পুজো-আচ্চা অবশ্য মেয়েরা খুব ছোটবেলায়ও শুরু করে। তাহলেও দেওয়ানী একেবারে শিশু নয় এটুকু আন্দাজ করা যাচ্ছে। কিন্তু অনুমান তো অনেক কিছুই করা যাচ্ছে। আসল দর্শনলাভটা হবে কখন?

পরাশরের দিকে চাইলাম। তার সে ব্যাপারের জন্যে কোন ব্যস্ততাই যেন নেই। দেওয়ানীর মত জাতিস্মরা মেয়ের যেখানে বাস সে বাড়িতে একটু বসতে পেয়েই সে যেন কৃতার্থ।

লৌকিকতার খাতিরে প্রসাদ বলে পরিবেশিত খাবার তখন একটু মুখে তুলতে হচ্ছে। বৃদ্ধ আমাদের খাওয়া তদারক করবার জন্যেই একটু দূরে ফরাসের ওপর গিয়ে বসেছেন।

শেষ পর্যন্ত আজকের মত এই প্রসাদ খাইয়েই বিদায় করবে নাকি!

পরাশরের তাতে নিশ্চয় আপত্তি হবে না। কিন্তু আমার পক্ষে তো এমন করে তীর্থের কাক হয়ে বসে থাকা অসম্ভব।

যে ক'টা দিন এই আসা যাওয়ায় নষ্ট হবে সেটাই সময়ের সম্পূর্ণ লোকসান। সে লোকসান যত কমের মধ্যে রাখা যায় সেই চেষ্টা আমায় করতেই হবে।

ফলমূল পেঁড়া জাতীয় মিষ্টি একটু মুখে ছুঁইয়ে সরবতের

গ্লাসটায় চুমুক দিয়ে বেশ একটু তৃপ্তিই পেলাম। স্টেশনে নেমে এক কাপ চা খাওয়ারও তো পরাশর সুযোগ দেয়নি। চা না হোক জলীয় একটা পানীয়ের বিশেষ দরকার ছিল।

সরবৎটা শেষ করতে করতে পরাশরের দিকে একবার চাইলাম।

আমি তো এতক্ষণ অনেক আলাপ চালালাম। এবার আসল কথাটা যাতে সে তোলে চোখের ইঙ্গিতে তাকে সেই কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। পরাশর তার প্রসাদ খেতেই তন্ময়। সরবতের গ্লাস পর্যন্ত এখনো পৌঁছায়নি। অগত্যা নিজেকেই কথাটা তুলতে হল। বেশ একটু মিনতির সুরে বললাম, আচ্ছা শেঠজি—

বাধা পেতে হল ওইখানেই। শেঠজী বলে যাঁকে সম্মান দেখাতে চেয়েছিলাম পাগড়ি বাঁধা সেই বৃদ্ধ বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি শেঠজী-টেঠজী নয়, ও সম্বোধন করে আমায় অপমান করবেন না।

এ আবার কি কাণ্ড! শেঠজী বলাটা অপমান? শেঠজী না বলে কি বলব? বৃদ্ধ নিজেই অবশ্য সমস্যাটা মিটিয়ে দিলেন। বললেন, আমরা এদেশে এসে বসবাস করলেও কাশ্মিরী দৈবাচার্য বংশ। আমায় পণ্ডিতজী বলতে পারেন।

তাহলে মিনতিটা শুনুন পণ্ডিতজী, বিনয়ে কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে বললাম, আপনার ওই দেওয়ানীকে যদি একবার দেখিয়ে দেন।

দেওয়ানীকে দেখিয়ে দেব? বুড়ো পণ্ডিতজী আমার দিকে একদৃষ্টে খানিক তাকিয়ে রইলেন।

এবার কিন্তু সে চোখের দৃষ্টিতে বা মুখের ভাবে ক্ষোভ কি রাগের কোন চিহ্ন নেই। আছে তাতে পুরোপুরি অবজ্ঞা মেশানো কৌতুক।

এ কৌতুক জাগাবার মত কি করেছি বুঝতে না পেরে আমি তখন পরাশরের দিকেই সাহায্যের আশায় তাকিয়েছি। সাহায্য অবশ্য পেলাম না।

পরাশর যেন কিসের তন্ময়তায় ইহজগতেই নেই। আমার প্রশ্ন আর বৃদ্ধ পণ্ডিতজীর উত্তর তার কানেই যায়নি মনে হল।

কৌতুকের সঙ্গে একটু করুণা মুখের ভাবে মিশিয়ে তিনি এবার

বললেন, দেওয়ানীকে দেখিয়ে দেবার ক্ষমতা কি অধিকার কারুর নেই। সে যদি ইচ্ছে করে তাহলে নিজেই এসে আপনাকে দেখা দেবে। আপনারা যে এসেছেন তা হয়তো এতক্ষণে সে নিজে থেকে জেনেছে!

হতভম্ব হয়ে পণ্ডিতজীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুড়ো বলে কি! হয়তো এতক্ষণে আমাদের আসার কথা জেনেছে! তার মানে অন্তর্যামী এই কথাই বুঝতে হবে। পরাশরের পাল্লায় পড়ে ভাল বুজরুকীর মধ্যে তো এসে পড়লাম!

পণ্ডিতজী যা বললেন তার আর একটা তাৎপর্যও তো রীতিমত গোলমেলে!

দেওয়ানী নিজে থেকেই আমাদের আসার কথা জানতে পারলেই হবে না, তার আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হওয়া চাই!

সে ইচ্ছেই যদি আজ না হয়?

ভয়ে ভয়ে সেই সম্ভাবনা নিয়ে বাইরে যথাসম্ভব ভক্তিভাব দেখিয়ে এবার প্রশ্ন করলাম, আজ আমাদের দর্শন পাবার আশা তাহলে আছে কি?

কেমন করে বলব! পণ্ডিতজী একেবারে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। আমাদের ওপর।—এখুনি পেতে পারেন। আবার এক মাস ধন্না দিয়েও বিফল হয়ে ফিরে যেতে পারেন। অমন গেছেও অনেকে।

ও বাবা, এ যে একেবারে পয়লা নম্বর ধড়িবাজের হাতে পড়েছি!

সরাসরি পরাশরকেই তাই এবার জিজ্ঞেস করতে হল, শুনলে তো পরাশর! আজ হয়তো দেখা না-ও হতে পারে!

আজ না হয় কাল হবে!—নির্বিকারভাবে জানালে পরাশর। এ তো জোর-জুলুমে আদায় করবার জিনিস নয়।

পরাশরের জবাব শুনে আমার চক্ষুস্থির। পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে উঠল এই নির্বিকার উত্তরে। গলাটা মোলায়েম রাখবার চেষ্টা না করেই বললাম, আমায় তো তাহলে আজই ফিরে যেতে হয়। আর অপেক্ষা করবার উপায় আমার নেই।

॥ চার ॥

অপেক্ষা করবার দরকার হল না।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই পণ্ডিতজীকে উঠে দাঁড়াতে দেখলাম।

আমাদের দিকে ফিরে একটু হেসে তিনি বললেন, আপনাদের ভাগ্য ভাল। দেওয়ানী নিজে থেকেই আপনাদের দর্শন দিতে ডাকছেন।

ডাকছে! শুনে চমকিত হলাম। কিন্তু পণ্ডিতজীও অন্তর্যামী নাকি! ডাকছে যে সেকথা উনি জানলেন কি করে?

না, টেলিপ্যাথি গোছের কিছু নয়; বাস্তব দূত অর্থাৎ দূতী মারফৎই দেওয়ানীর ডাকের খবরটা এসেছে।

বাইরের মহলে আমাদের বসবার ঘর। তারপর একটা পাথরে বাঁধানো উঠোন পেরিয়ে ভেতর মহল, যেখান থেকে আগে পুজোর ঘণ্টার শব্দ পেয়েছি।

আমাদের ঘর পর্যন্ত আসবার আগে উঠোন পার হবার সময়ই পণ্ডিতজি তাকে দেখতে পেয়ে তার বার্তাটা নিশ্চয় অনুমান করেছেন।

পণ্ডিতজী যা বলেছেন দূতী এসে সেই কথাই আমাদের জানাল।

তার কথা শুনব কি, তার চেহারা পোশাকের দিকেই অবাক হয়ে তখন তাকিয়েছি। দূতী হয়ে যে এসেছে, রাজনটী বললেই তার যথার্থ পরিচয় হয়। পোশাকের যেমন জৌলুস তেমনি চটক চেহারার। চলায়-বলায় যেন লাস্যের ঢেউ তুলে যাচ্ছে। পুজো আচ্চা নিয়ে তন্ময় জাতিস্মরা একটা মেয়ের এই প্রতিনিধি! দূতীকে দেখে যদি অবাক হয়ে থাকি স্বয়ং দেওয়ানীকে দেখে যাকে বলে একেবারে স্তম্ভিত।

প্রথম বিস্ময় হল দেওয়ানীর বয়স বুঝে। জাতিস্মরা মেয়ে বলতে নেহাৎ শিশু না হোক বালিকা বয়সের বেশী কিছু ভাবিনি। সাধারণত জন্মান্তরের স্মৃতি এই ছোটবেলাতেই কারুর কারুর মধ্যে দেখা যায়। একটু বয়স বাড়লেই যে স্মৃতি আর থাকে না।

কিন্তু বালিকা দূরের কথা এ যে কিশোরীও নয় রীতিমত পূর্ণ-যৌবনা যুবতী।

আর যুবতী শুধু নয়—কি তার বেশভূষা আর রূপ! দূতী যদি

মর্ত্যরাজ্যের রাজনটী হয় তাহলে দেবযানী মুনিমনোলোভা বিলোল-কটাক্ষ স্বর্গের অপ্সরী!

বাইরের উঠোন পেরিয়ে ভেতর মহলের যে ঘরটিতে তখন আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুরানো হলেও তার আসবাবপত্র সাজসজ্জা খুব বিবর্ণ নয়।

সেই ঘরেরই পিছন দিকে ছাদ থেকে ঝোলানো একটি জরি দেওয়া মখমলের পর্দার সামনে দেওযানী একটি ছোট নিচু চৌকির ওপর আধশোয়া অবস্থায় বসে আছে। আগেকার দিনের রাজকুমারীদের মত তার চৌকির দুপাশে দুজন করে সখী দাঁড়িয়ে।

আমাদের ঢুকতে দেখে দেওযানী একটু সোজা হয়ে উঠে বসল। তারপর পাশের একটি চৌকিতে আমাদের বসতে ইঙ্গিত করে বিশেষ করে আমার দিকেই ফিরে চোখে মুখে হাসির ঝিলিক ফুটিয়ে বললে, এতদিন বাদে এলে? কিন্তু এখনো এত অবিশ্বাস?

কি বলছে কি জাতিস্মরা সুন্দরী! আমিই কি ভুল শুনছি! খানিক আগে থেকে মাথাটায় কেমন একটা ঝিমঝিমে ভাব হচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যি মাথা খারাপ তো হয়নি। তাহলে মানে কি এসব কথার!

দেওযানী তখন শুধু আমার কথাই নয় পরাশরের কথাও বলে যাচ্ছে। বলছে, তোমার বন্ধুর নেশা তো গোয়েন্দাগিরি! তবু তার মনে তো এত সন্দেহ নেই। দু'চোখ তখন আপনা থেকে বিস্ফারিত। মুখে যেন কথাই সরতে চায় না। তবু কোনরকমে অতি কষ্টে বিমূঢ় বিস্ময়টা প্রকাশ করলাম, তুমি, মানে—মানে আপনি আমাদের পরিচয় জানেন!

জানি। দেওযানীর মুখে রহস্যময় হাসি, আর তোমার সঙ্গে পরিচয় কি আজ!

তার মানে?

মানে যদি বলি এখন কি কিছু লাভ হবে? দেওযানীর মুখে সেই রহস্যের হাসি, সে সব কথা তুমি বিশ্বাসই করবে না। তবে কলকাতা থেকে এতদূর তোমায় বৃথাই এসে ফিরে যেতে দেব না। আগের স্মৃতি না ফিরুক এখনকার স্মৃতি খানিক মুছে দিচ্ছি। এই নাও...

ডানহাতটা নেড়ে আমার দিকে কি যেন ছিটোবার ভঙ্গির সঙ্গে দেওযানীর ওই শেষ কথাটুকুই শুনেছি। তারপর কি যে হল কিছুই মনে নেই। সব কিছু যেন এক মুহূর্তে চোখের সামনে ঝাপসা

হয়ে গেল। পা দুটো যেন টলে গেল আপনা থেকে। তারপর সব কিছু ফাঁকা।

জ্ঞান ফিরে আসার স্মৃতিটা কিন্তু সুমধুর। গোড়ায় বিছানার কোমলতাটাই টের পেলাম। তারপর চোখ খুলে কয়েকটা মুখ। তার মধ্যে দেওয়ানীর মুখটাই সবচেয়ে স্পষ্ট।

এক মুহূর্ত সব কথা স্মরণ হতেই এক ঝটকায় উঠে বসলাম। যে ঘরে দেওয়ানীর দর্শনের জন্য এসেছিলাম সেই ঘরেই আছি। তবে এতক্ষণ দেওয়ানীর নিজের বসবার চৌকির উপরই শুয়েছিলাম ঘরে এখন দেওয়ানী আর পণ্ডিতজী ছাড়া আর কেউ নেই। দেওয়ানী আমার মাথার কাছেই বসেছিল। উঠে বসতে একটু হেসে বললে, আমায় মাফ কর। তুমি যে এত দুর্বল তা আমার মনে ছিল না।

সে কথার জবাব না দিয়ে বেশ একটু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, পরাশর, মানে আমার বন্ধু কোথায়?

কোথাও না, এই তোমার সামনে। পরাশর হাসিমুখে ঘরে ঢুকে একান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললে, তুমি জাগনি বলে দর্পণা দেবীকে একটু দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি একবার দেখবে নাকি?

না। এবার উঠে দাঁড়িয়েই বললাম, তোমার কাজ যদি হয়ে গিয়ে থাকে তো এখন চল। স্টেশনে যেতে হবে।

হ্যাঁ তাই যান মিঃ ভর্মা—দেওয়ানী আমার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে উঠে কৌতুকভরা মুখে বললে, কৃত্তিবাসের মেজাজ এখন খিচড়ে গেছে। মাথা ঠাণ্ডা হতে সময় লাগবে। তবে স্টেশনে গিয়ে লাভ নেই। আজ আপনাদের যাওয়া হবে না।

আচ্ছা হয় কি না দেখা যাবে। বলে দেওয়ানীর দিকে একবার ফিরেও না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। হন হন করে একাই চলে আসছিলাম। উঠোন পেরিয়ে দেউড়ি দিয়ে বাইরের রাস্তায় আসার পর পরাশর আমায় জিজ্ঞাসা করলে, তোমার হঠাৎ কি হল বল তো? অত মেজাজ হল কেন হঠাৎ?

কেন হল জিজ্ঞাসা করছ? রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই ফেটে পড়লাম, কি বুজরুকীর ব্যবসা এখানে চলছে তা বুঝতে পেরেছ?

বুজরুকী! পরাশরের গলাটা বেশ ক্ষুব্ধ মনে হল।

বুজরুকী নয়? জ্বালাধরা গলাতেই বললাম, কি ফন্দিতে সব কিছু সাজানো তা দেখতে পেলে না? সরবতে ওরা অজ্ঞান করার

ওষুধ মিশিয়েছিল—

কি বলছ কি! এবার পরাশরের প্রতিবাদ বেশ জোরালো, সরবৎ তো আমিও খেয়েছি।

তুমিও খেয়েছ! আমায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত হতে হল, তাহলে তাহলে...

তাহলে শুধু তোমার সরবতেই ওষুধ মিশিয়েছিল বলতে চাও! পরাশর আমার সন্দেহটাকে ভাষা দিয়েই বললে, কিন্তু এ পক্ষপাতিত্ব কেন? আর তাছাড়া আমাদের পরিচয়গুলো জানা, সেটাও কি বুজরুকী বলবে তুমি!

কি বলবে তাহলে? নিজের খানিক আগের সন্দেহে একটু যেন নাড়া খেয়ে পরাশরের বক্তব্যটাই শুনতে চাইলাম।

আর যাই বলি, বুজরুকী বলতে একটু বাধে না কি? পরাশর তার যুক্তিটা জানালে, আমরা অনেক দিন ভেবে-চিন্তে নয়, হঠাৎ আসবার খেয়ালে চলে এসেছি। আসবার কথা কাউকে জানিয়েও আসিনি যে আমাদের সম্বন্ধে আগে থাকতে কিছু জানবার সুযোগ হবে। সে অবস্থায় আমাদের অমন নির্ভুল পরিচয় বলা বেশ একটু আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি...?

স্থান কাল ভুলে রাস্তায় দাঁড়িয়েই আরো কিছু আলোচনা হয়তো আমাদের হত, কিন্তু হঠাৎ মতিকোঠির চাকরের আবির্ভাবে এ প্রসঙ্গ বন্ধ করতে হল।

প্রথম আমাদের জন্যে পুজোর প্রসাদ আর সরবৎ যে এনেছিল সেই চাকরই আমাদের সাহায্যের জন্যে এসেছে। তাকে পাঠিয়েছে স্বয়ং দেওযানী। সে আমাদের টাঙ্গা ডেকে দেবে।

চাকর এসে সেই কথাই জানালে। এখানে এই ধুপের মধ্যে কতক্ষণ খাড়া থাকবেন হুজুর। ভিতরে বসুন, আপনাদের টাঙ্গা ডেকে দিচ্ছি।

না, ভেতরে বসব না। টাঙ্গাও ডেকে দিতে হবে না। আগের মেজাজটা আবার চাগিয়ে তুলে বললাম, আমরাই পারব।

মতিকোঠির অনুচর কিন্তু নাছোড়বান্দা। সঙ্গে সঙ্গে তো চললই, তার মধ্যে নিজের নাম-ধাম পরিচয় থেকে মতিকোঠির বিষয়েও অনেক কিছু জানিয়ে দিলে। নাম তার বদ্রীদাস। সেও এদেশের মানুষ নয়। তবে কাশ্মীর নয়, হিমাচল প্রদেশ থেকে এসেছে। এ বাড়িতে

কাজ করছে প্রায় সাত বছর, কিন্তু আর এখানে থাকবে না। একটা কোথাও সুবিধে পেলেই চলে যাবে। মতিকোঠির রাস্তা থেকে আমরা তখন টাঙ্গা ধরতে কিছু দূরের বড় রাস্তার মোড়ের দিকে যাচ্ছি। বদ্রীদাস এবার তার আসল প্রার্থনাই জানিয়ে বসল।

আমরা তো বড় রকমের আদমী। আমরা তাকে একটা চাকরি দিয়ে যদি কলকাতা নিয়ে যাই। কলকাতা খুব বড় শহর সে জানে। সেখানে তার দেশোয়ালী ভাইও অনেক আছে। আমরা যদি শুধু তাকে সঙ্গে নিয়ে যাই তাহলে চাকরিতে না রাখলেও সে নিজেই কাজকর্ম যোগাড় করে নিতে পারবে। আমাদের নিয়ে যাবার ঋণও শোধ করে দেবে।

কিন্তু তুমি এ চাকরি ছেড়ে যেতে চাও কেন? পরাশরই জিজ্ঞাসা করল।

এমনি চাই হুজুর। বদ্রীদাস প্রথমে সাবধানী জবাব দিলে, এক জায়গায় বেশী দিন মন টেঁকে না তাই।

শুধু তাই জন্যে? এবার আমি একটু সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ন স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম, না, এখানে অন্য কিছু অসুবিধা আছে?

বদ্রীদাস খানিক চুপ করে মাথা নিচু করে রইল। তারপর বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বললে, আপনারা গরীবের মা বাপ হুজুর। আপনাদের কাছে ঝুট কি করে বলব! এ বাড়িতে চাকরির বড় ঝামেলা। আমি আর পেরে উঠছি না।

বড় রাস্তায় তখন পৌঁছে গেছি। দূরের টাঙ্গার আস্তানায় একটা দুটো ঘোড়া খোলা টাঙ্গাও দেখা যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে তাদের একটা ভাড়াও করা যায়। কিন্তু তখন বদ্রীদাসকে ছেড়ে যাওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে।

বড় রাস্তার মোড়ে একটা বড় ডালপালা ছড়ানো অশথ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তার পেট থেকে কথা বার করবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

বদ্রীদাসকে দিয়ে কথা বলানো খুব শক্ত নয়। সে নিজেই অনেক কিছু বলার জন্য ব্যাকুল। শুধু একটু উসকানি দেওয়াই দরকার।

মতিকোঠির বাড়ির চাকরির ঝামেলার কথা শুনে সেই উসকানির ভাল সুযোগই মিলল। একটু সহানুভূতি দেখিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম,

ঝামেলা কিসের, কাজ বেশী? মাইনে কম? না মনিবরা কড়া বদমেজাজী!

ওসব কিছু নয় হুজুর—বদ্রীদাস জিভ কামড়ে নিজের কান মলে জানালে, মিথ্যে বললে দর্পণা দেবীর শাপে নির্বংশ হতে হবে। আসল ঝামেলা কি জানেন?

বদ্রীদাস একটু চুপ করে থেকে যা বললে তা প্রথমটা একটু ধাঁধার মতই লাগল। সে যা জানালে তাতে মনে হল ঠাকুর দেবতার কাজ বলেই ও চাকরিতে তার বিশেষ আপত্তি।

কেন? ঠাকুর দেবতার কাজ কি খারাপ? অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, বিশেষ করে তুমি যা বলছ ঠাকুর দেবতা যদি সেই রকম জাগ্রত হয়?

আজ্ঞে সেই জন্যেই খারাপ! বদ্রীদাস নিজের কথাটা এবার বিশদ করলে, এরকম ঠাকুর দেবতা আর দেবীজীর মত মানুষের কাছে বেশী থাকতে নেই।

দেবীজী মানে দেওয়ানী দেবীর কথা বলছ? জিজ্ঞাসা করলে পরাশর।

জী হাঁ, মাথা নেড়ে জানালে বদ্রীদাস, উনিই তো আমাদের দেবীজী।

কিন্তু ঠাকুর দেবতা আর ওঁর মত দেবীজীর কাছে থাকতে নেই কেন? তুমি তো বললে যে মনিবরা কড়া বদমেজাজী নয়। তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন, তবে?

বুঝতে পারলেন না হুজুর! বদ্রীদাস যেন আমাদের অজ্ঞতায় একটু অবাক হল—প্রথমত জাগ্রত ঠাকুর দেবতার কাজ, যেটুকু ভার নিজের ওপর থাকে তাতে সারাক্ষণ কোথায় কি গল্‌তি হয়ে যায় তার ভয়। আর দেবীজীর বেলায় খারাপ লাগে দিনের পর দিন ওঁর ওই ক্ষমতার বহর দেখতে।

ক্ষমতার বহর দেখতে খারাপ লাগে! এবার আমি রীতিমত উৎসুক, উনি সব ভুল-ভাল যা খুশি কথা বলে সবাইকে ভাঁওতা দেন বুঝি!

আবার বদ্রীদাসের জিভ বেরিয়ে এল। তা কামড়ে সেই সঙ্গে আবার কানমলা খেয়ে বেশ একটু গরমই হয়ে উঠল আমার উপর।

ওসব পাপ কথা বলবেন না হুজুর! আপনার বিশ্বাস না থাকে এখানে আসবেন না, কিন্তু ওসব কথা যদি বলেন তাহলে আপনার সঙ্গে যেতে ও কথা বলতেই চাই না। ওই ওখানে টাঙ্গা আছে, ভাড়া

করে নিন। আমি চললাম। নমস্তে।

বদ্রীদাস সত্যই ফিরে মতিকোঠির দিকে হাঁটতে শুরু করলে। নিজের আহাম্মুকীতে তখন হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। মতি-কোঠির ভেতরের খবর জানবার এমন সুযোগ, বদ্রীদাসের কথা উল্টো বুঝে বুঝি হারালাম।

পরাশর ও আমি দুজনেই ছুটে গিয়ে বদ্রীকে এবার থামালাম। কিন্তু সে কি সহজে ঠাণ্ডা হয়। শেষকালে পরাশরের কথার প্যাঁচেই তার রাগ পড়ল।

আরে দেবীজীর মহিমা কি আমরা জানি না—নাহলে সেই কলকাতা থেকে এতদূর ছুটে এসেছি কেন? আমার দোস্ত শুধু তোমায় একটু পরীক্ষা করে দেখছিলেন।

আমায় আর কি পরীক্ষা করবেন হুজুর, বদ্রীদাস এতক্ষণে নরম হয়ে বললে, আমার শিরা কেটে দেখবেন দর্পণা দেবী আর দেবীজীর নাম লেখা আছে, তবু এখানে থাকতে দিল নারাজ, শুনুন, নারাজ হররোজ দুনিয়ার এত সাচ্চা খবর জানতে। দেবীজী তো ঝুট কিছু বলেন না। উনি তো শুধু নিজের আগের সব জনমের কথা বলেন না। দর্পণা দেবীর দয়ায় উনি সব কিছুই জানতে পারেন, আর যা জানেন তা কারুর পরোয়া না করে সাফ সাফ বলে দেন। যেমন কাল এক বহুৎ বড়া শেঠজীকে বলে দিলেন, আগের জনমে তুমি অনেক পাপ করেছিলে তাই এবার টাকার কুমীর হয়েছ। শেঠজী তাতে হাত জোড় করে বলেছিল, পাপ করেছি বলে এত টাকার মালিক হয়েছি! এ কেমন কথা দেবীজী!

দেবীজী তাতে হেসে বলেছিল, আরে সেই তো তোমার পরীক্ষা। এবার এই দৌলত দিয়ে যদি প্রায়শ্চিত্ত না কর তাহলে সচমুচ কুমীর হবে পরের জন্মে।

বদ্রী থামতে একটু সাবধান হয়েই এবার জিজ্ঞাসা করলাম,—শেঠজীর এই হাল দেখে তোমার খারাপ লেগেছে?

না হুজুর!—বদ্রী প্রতিবাদ জানালে,—শেঠজীর মত মানুষকে এই রকম সাফ কথা তো শোনানই চাই। আমার কিন্তু দুনিয়ার আসলি চেহারা দেখতেই আর ভাল লাগে না। দেবীজীর কাছে সবাই কত আশা নিয়ে আসে কিন্তু এলে উনি রেখে ঢেকে কিছু বলেন না। এই সেদিন একজন এসে দর্পণা দেবীর পুজো দিয়ে গেল। তার দশ

বছরের হারানো ছেলে উনি যেমন ভাবে যেদিন বলেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে সেইদিন ফিরে এসেছে। এসব যেমন বলেন তেমন অন্য রকম খাঁটি কথাও জানিয়ে দেন। সেদিন একজনকে বলে দিলেন, এখানে কেন এসেছিস্, তুই তো ঠগবাজ, নিজের ভাই বোন সকলকে ঠকিয়েছিস তোর তাই এমন রোগ হয়েছে, যা আর সারবে না। আর একজনকে আবার বললেন, তোর বৌ তোকে ছেড়ে পালাবে না তো কি করবে। তুই তো ওকে আর জন্মে পরের ঘর থেকে জুলুম করে কেড়ে এনেছিলি। মুশকিল কি জানেন হুজুর, এরা সব দেবীজীর কাছে সাফ বাত শুনে আমাকে এসে ধরে পড়ে। আমি যেন দেবীজীকে বলে কয়ে সাধ্য সাধনা করে ওদের নসীব বদলে দিতে পারি! এসব আর সইতে পারি না হুজুর, তাই আপনাদের মত সকলকে বাইরে কোথাও কাজের জন্য আর্জি জানাই। কিন্তু তা কি আর আমার বরাতে আছে?

বদ্রীদাস এর পর হঠাৎ যেন কি বুঝে মুখ বন্ধ করে ফেলে।

আমাদের জন্যে টাঙ্গা ডেকে দিতে অবশ্য ত্রুটি করে না। টাঙ্গা-ওয়ালাকে স্টেশনে যেতে বলছি শুনে শুধু একটু মন্তব্য করে—কেন মিছে স্টেশনে যাচ্ছেন হুজুর। আজ তো আপনাদের যাওয়া হবে না।

যাওয়া হবে না কি রকম!—আমার আগেকার জেদ আবার চাড়া দিয়ে ওঠে, ট্রেন চলা কি সব বন্ধ হয়ে গেছে এ স্টেশনে?

ট্রেন বন্ধ হবে কেন হুজুর!—বদ্রীদাস যেন আমাদের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে বলে, কিন্তু ট্রেন চললেই তো যাওয়া যায় না। তবু স্টেশনে গিয়েই একবার দেখুন।

॥ পাঁচ ॥

স্টেশনে গিয়েই দেখলাম। ফিরে যাবার ট্রেন ঠিক মতই আছে। তা হঠাৎ বন্ধ হবার মত কোন খবর রেলের লোকেরা অন্তত পায়নি।

এখান থেকে সেকেন্দ্রাবাদ পর্যন্ত যাবার টিকিট করতে হয়। সে টিকিট কেনার কোন অসুবিধাই হল না। লেফ্‌ট লাগেজ থেকে মাল উদ্ধার করে ওয়েটিং রুমের অ্যাটেন্ড্যাণ্টকে বখশিশ দিয়ে সেখানে স্নান-টান সেরে নিলাম। স্টেশনে একই ঘরের মধ্যে দুদিকে ভাগ করা আমিষ আর শাকাহারী ভোজনালয়ের চেহারা দেখে ভক্তি হল

না। স্টেশনের বাইরেই দক্ষিণ ভারতীয় একটা রেস্তোরাঁ পেয়ে সেখানে ইড্‌লি দোসা উপমা দিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজটা ভাল ভাবেই সারতে পরাশরের দিকে চেয়ে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, কি? আট-চল্লিশ দুগুনে ছিয়ানব্বই ঘণ্টার হয়রানি সার্থক মনে হচ্ছে? বেশ খুশি মনেই ফিরে যাচ্ছ তো!

ফিরে তো এখন যাচ্ছি না! পরাশর যেন ছোটখাটো বোমার মত জবাবটা ছাড়ল।

খাওয়া বন্ধ করে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। সেই বদ্রীদাসের পেট থেকে কথা বার করবার চেষ্টার পর টাঙগায় ওঠা থেকে পরাশর কেমন যেন ভোম্ মেরে ছিল বটে। নেহাৎ আমার ইচ্ছে তাই করতে হয় বলে টিকিট কেনা থেকে লাগেজ বার করা পর্যন্ত সব কাজ যন্ত্রের মত করে গেছে।

সেই আচ্ছন্নতার মূল কি তার এই ধারণা যে আজ এখান থেকে যাওয়া হবে না? দেওযানীর কথায় এতখানি এখনো তার বিশ্বাস?

স্পষ্ট করে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম, ফিরে যাচ্ছি না মানে? ট্রেন এলেও তুমি কি তাতে উঠবে না? টিকিট কিনেছি তাহলে কি জন্যে?

টিকিট কিনি আর যাই কিনি যাওয়া আজ হবে না! পরাশর তার বিশ্বাসে অটল।

কেন হবে না? যাওয়ার বাধা তো দেখতে পাচ্ছি না কিছু!

এখন পাচ্ছি না। তবে...

তবে পরে পাব!—পরাশরের জবাবটা পূরণ করে দিয়ে একটু ভর্ৎসনার সুরেই বললাম, তোমার এ দশা কবে থেকে হল? বুদ্ধি-শুদ্ধিতে কি ছাতা ধরে গেছে? দু-একটা কথা না হয় ঠিকই আন্দাজ করেছে, তা বলে ওই বদ্রীদাস যা বলে তাও তুমি বিশ্বাস কর? সত্যিই ওকে বাক্‌সিদ্ধা ভাবছ? ও আজ আমাদের যাওয়া হবে না বলেছে ওর ভবিষ্যদ্বাণী ফলবেই মনে করছ?

আর তো কয়েকটা মাত্র ঘণ্টা। অপেক্ষা করেই দেখ।

প্রসঙ্গটা এইভাবে থামিয়ে পরাশর তার ধারণাতেই অটল রইল।

কিন্তু সত্যিই দেওযানীর কথাই ফলল। সেদিন যাওয়া আমাদের হল না। ট্রেনের গোলমালের জন্যে নয়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এমন

একটা ব্যাপারে আমি নিজেও যাওয়া বন্ধ করার পক্ষেই মত দিতে বাধ্য হলাম।

আমাদের ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক বাকি।

ওয়েটিং রুমে বসেই লাগেজ-টাগেজ বাঁধা শেষ করে ফেলেছি। হঠাৎ ওয়েটিং রুমের দরজায় স্টেশনের এক চাপরাশি এসে হাজির।

ওয়েটিং রুমের অ্যাটেন্ড্যাণ্ট তখন বখশিশের আশ্বাসে আমাদের প্রায় পাহারা দিয়ে বসে আছে। ট্রেন এলেই যাতে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

চাপরাশি এসে দরজা থেকেই স্থানীয় তেলেগুতে তাকে কি বলল সবটা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তার বিকৃত উচ্চারণে বর্মা আর ভদ্র গোছের দুটো শব্দ শুনে একটু অবাক হলাম। চাপরাশি কি আমাদেরই খোঁজ করতে এসেছে নাকি? কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

এই পাণ্ডব-বর্জিত শহরে সবাই তো আর দেওয়ানীর মত অন্তর্যামী নয়। এখান থেকে আমাদের নিজেদের নামে বার্থ রিজার্ভেশনের দরকার হয়নি। নেহাৎ সাধারণভাবে দুটো উচ্চ শ্রেণীর টিকিট কিনেছি। সুতরাং আমাদের নাম এখানকার স্টেশনের চাপরাশির মত মানুষের জানবার উপায়ও নেই।

কিন্তু যা অসম্ভব তাই হয়েছে জানা গেল। ওয়েটিং রুমের জমাদার হিন্দী জানে। সে চাপরাশির কথা শুনে হিন্দীতেই তা আমাদের বুঝিয়ে দিলে।

তার বোঝা ও বলার দোষে একটু অস্পষ্টভাবে হলেও ব্যাপারটা যা বুঝলাম তা এই যে স্টেশন মাস্টার হঠাৎ অত্যন্ত জরুরী একটা খবর পেয়েছেন। স্টেশনে ভর্মা ও ভড্রো নামের দুজন কেউ যদি থাকেন তাহলে এখুনি স্টেশনে মাস্টারের সঙ্গে যেন দেখা করেন। খবরটা দিয়ে জমাদার আমাদের কারুর ওই নাম কি না ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল।

এ খবর পাবার পর নামগুলো অস্বীকার করে চুপ করে বসে থাকা যায় না। চাপরাশির সঙ্গে স্টেশন মাস্টারের অফিস ঘরে যেতেই হল।

তাঁর কামরায় ঢুকতে স্টেশন মাস্টার বেশ সসম্মানেই উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ করলেন, আপনারাই কি ভার্মা আর ভড্রো?

কোন্ পদবীটা কার বুঝতে না পেরে তিনি একটু দ্বিধাগ্রস্ত-

ভাবে আমাদের দুজনের ওপর চোখ বোলালেন।

হ্যাঁ ইনি বর্মা, পরাশর বর্মা আর আর আমি কৃত্তিবাস ভদ্র। স্টেশন মাস্টারের উচ্চারণ শুধরে নিজেদের সঠিক পরিচয় তাঁকে দিলাম।

তারপর 'বসুন, বসুন!' বলে স্টেশন মাস্টারের সাদর আপ্যায়ন অগ্রাহ্য করে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো! হঠাৎ আমাদের নামে এ রকম তলব কেন? পুলিশ-টুলিশ থেকে খোঁজ নাকি?

না না! পুলিশ কি! স্টেশন মাস্টার অত্যন্ত লজ্জিতভাবে প্রতিবাদ করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা জোয়ালা-প্রসাদ বলে কাউকে চেনেন বোধহয়?

জোয়ালাপ্রসাদ! আমি তো বটেই পরাশরও নামটা শুনে তার ভিকারাবাদে আসার পর থেকে লাগা আচ্ছন্নতার ঘোর যেন এক নিমেষে কাটিয়ে উঠল।

কলকাতার জোয়ালাপ্রসাদ?

স্টেশন মাস্টার মাথা নেড়ে সায় দেওয়ায় পরাশর বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করলে, সে আপনার কাছে ভিকারাবাদ স্টেশনে আমাদের জানাবার জন্যে খবর পাঠিয়েছে!

আমরা এই স্টেশনে থাকব সে জানল কি করে? আমি পরাশরের সঙ্গে আমার সবিস্ময় প্রশ্নটাও যোগ করলাম।

না জানলে খবরটা পাঠালেন কি করে! স্টেশন মাস্টার আমার প্রশ্নটারই উত্তর দিয়ে আমাদের বিমূঢ়তা আরো বাড়ালেন।

কি খবর পাঠিয়েছে? পরাশর এবার জিজ্ঞাসা করলে।

তাঁর সঙ্গে এখুনি একবার গিয়ে দেখা করতে। জানালেন স্টেশন মাস্টার।

অনুরোধটা বেশ একটু অদ্ভুত! সেই কথাটাই আমার কথায় বুঝিয়ে দিয়ে বললাম,—সে খবর যখন পাঠিয়েছে তখন দেখা নিশ্চয় করব! কিন্তু সেটা এখুনি কি করে সম্ভব? তার জন্যে কলকাতা পর্যন্ত যাবার সময়টা তো লাগবে?

না না, কলকাতায় নয়! স্টেশন মাস্টার সাহেব এবার আমাদের একেবারে হতভম্ব করে দিয়ে বললেন—জোয়ালাপ্রসাদজী এই ভিকারাবাদেই আছেন। তিনি কি নাকি বিপদে পড়েছেন, তাই যেখানে

আছেন সেখানেই আপনাদের নিয়ে যাবার জন্যে আমার কাছে চিঠিতে খবর দিয়ে লোক পাঠিয়েছেন।

জোয়ালাপ্রসাদ এই ভিকারাবাদে আছে?

প্রায় স্বগতোক্তির মত কথাটা আমার মুখ দিয়ে বার হতেই স্টেশন মাস্টার সাহেব একটা ভাঁজ করা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, হ্যাঁ, এই দেখুন না চিঠিটা।

দেখলাম চিঠিটা। নিজেও পড়লাম, পড়ালাম পরাশরকেও।

চিঠি যে জোয়ালাপ্রসাদের লেখা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার সেই ধরে ধরে প্রায় কপিবুকের মত নিখুঁত ছাঁচে লেখা। ভুল ইংরেজি না হলেও ভুল বানানের চিঠি। নিচে সইটাও যে তার, আমার অন্তত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার সই করা অমন অজস্র চিঠি এখনো আমার কলকাতার অফিসের ড্রয়ারে জমা করা আছে।

জোয়ালাপ্রসাদ তার স্বভাব-মাফিক এবার কিন্তু বড় চিঠি লেখেনি। মাত্র কয়েক লাইনে যা লিখেছে তার মর্ম হল এই যে সে এক বিশেষ কাজে ভিকারাবাদে আসতে বাধ্য হয়ে দারুণ বিপদে পড়েছে। আজই খানিক আগে দৈবাৎ আমাদের আসার খবর পেয়ে আর সেই সঙ্গে আজই আমরা চলে যাচ্ছি জেনে হতাশার আশায় ভর করে একজনকে স্টেশনে পাঠাচ্ছে। কোন রকমে এ চিঠি যদি আমাদের হাতে পড়ে তাহলে তাকে প্রাণে বাঁচাবার জন্যে অবিলম্বে যেন তার পাঠানো লোকটির সঙ্গে চলে আসি।

জোয়ালাপ্রসাদ এ চিঠিতে হতাশার ইংরেজি 'ডেসপেয়ার' এর বানান করেছে ডি, ই, এস, পি, এ আর, ই দিয়ে। আর 'অবিলম্বে'র ইংরেজি 'ইমিডিয়েট্‌লি' লিখেছে আই, এম, আই দিয়ে।

তার সইয়র মত এই বানানগুলিও তার নিজস্ব ও মার্কামারা। কিন্তু সত্যিই তার হঠাৎ কি বিপদ হল? হঠাৎ ভিকারাবাদেই বা সে কেন?

চোখে এই সব প্রশ্ন নিয়েই পরাশরের দিকে তাকালাম।

চিঠিটা তখন তার হাতে। তা থেকে চোখটা আমার দিকে তুলে জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে এখন? আমাদের ট্রেন আসতে তো আর দেরী নেই।

করবার আর কি আছে! এক মুহূর্তে মনস্থির করে নিয়ে বলতে হল, সত্যি হোক আর কাল্পনিক হোক জোয়ালাপ্রসাদ এই বিদেশ

বিভুঁয়ে বিপদে পড়েছে জেনে ট্রেনে চড়ে চলে যেতে পা-ই উঠবে না। সুতরাং চল কোথায় কাকে জোয়ালা পাঠিয়েছে দেখা যাক্।

স্টেশন মাস্টারকে ধন্যবাদ দিয়ে টিকিট দুটির রিফাণ্ড নিয়ে মোটঘাট সঙ্গে নিয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম। লাগেজ স্টেশনে রেখে যেতে পারতাম। কিন্তু তাতে লাভ নেই। জোয়ালাপ্রসাদের সমস্যা এক বেলায় মিটিয়ে আসা যাবে এরকম ভরসা নেই।

স্টেশনের বাইরে গিয়েই একটু অবাক। স্টেশন মাস্টারের চাপরাশি বাইরে নিয়ে গিয়ে যা দেখাল তাতো শুধু জোয়ালাপ্রসাদের লোক নয়, সেই সঙ্গে তার গাড়িটাও। জোয়ালাপ্রসাদ তাহলে নিজের গাড়ি নিয়েই এখানে এসেছে! ড্রাইভার শুধু আলাদা।

কিন্তু হঠাৎ তার মত মানুষের এই ভিকারাবাদের মত জায়গায় আসবার কারণ কি? এখানে এমন কি বিপদে সে পড়তে পারে যাতে আমাদের পাবার জন্য সে যেন অকূলে কূল পাওয়ার মত অস্থির হয়ে উঠতে পারে?

সবই কি তার কল্পনা? মালপত্র তুলে জোয়ালাপ্রসাদের গাড়িতে তার এখানকার আস্তানায় যেতে যেতে তার কথাই ভাবছিলাম।

জোয়ালার সঙ্গে আলাপ আমাদের বেশী দিনের নয়। বছর দুয়েকের মধ্যে সে কিন্তু আমাদের এক নাছোড়বান্দা ভক্ত ও বন্ধু হয়ে উঠেছে।

আলাপটা প্রথমে আমার সঙ্গে হলেও ভক্তিটা পরাশরের ওপরেই বেশী।

নাম শুনেই বোঝা যায় জোয়ালাপ্রসাদ বাঙালী নয়। দু-তিন পুরুষ তারা উত্তরপ্রদেশে কাটিয়ে কলকাতায় এক পুরুষ ধরে আছে। উত্তরপ্রদেশের আগে তাদের আদি বাস ছিল নাকি কাশ্মীরে।

আদি বাস যেখানেই থাক জোয়ালাপ্রসাদ অন্তত বাঙলা ভাষা দখল করে বাঙালী হবার জন্য এখন ব্যাকুল। উচ্চারণটা মারাত্মক হলেও মোটামুটি বাংলা সে পড়তে পারে। কিন্তু শুধু একটু পড়েই সে সন্তুষ্ট নয়, তার সর্বনাশা শখ হল বাংলা লেখবার।

এইটুকু বাঁচোয়া যে সে কবিতা লেখে না, লেখে গল্প। সে গল্প আবার সাধারণ সামাজিক ঐতিহাসিক কিছু নয়। গোয়েন্দা গল্প যাকে বলে।

এই গোয়েন্দা গল্প লিখে আমার কাগজে ছাপানো আর তাতে পরাশর বর্মার তারিফ পাওয়াই হল জোয়ালাপ্রসাদের স্বপ্ন।

পরাশর বর্মাকে আমার আগেই সে তার চাচা বিখ্যাত পণ্ডিত ট্রেডার্সের রামস্বরূপ কাউলের কাছে দেখেছে, কিন্তু পরাশরের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার অফিসে লেখা নিয়ে আসা যাওয়ার পর।

বলা বোধহয় বাহুল্য যে জোয়ালাপ্রসাদের একটা গল্পও এখনো পর্যন্ত ছাপতে পারিনি। পরাশরের কবিতা যদি আবোল তাবোল হয় জোয়ালার ডিটেকটিভ গল্প বিকারের প্রলাপ।

এ হেন গল্প আর ততোধিক সাংঘাতিক বাংলা ভাষার নমুনা নিয়ে বারবার আমার অফিসে ধন্না দিতে আসা সত্ত্বেও কেন যে তাকে সসম্মানে একেবারে বাতিল করে দিইনি তার কারণ জোয়ালার একেবারে সরল, প্রায় ছেলেমানুষের মত স্বভাব। কিছু হয়নি বলে বার বার বেশ কটু সমালোচনায় তার লেখা নস্যাৎ করে দিলেও তার রাগ অভিমান হতাশা কিছু নেই।

সব কিছু মেনে নিয়ে আধা বাংলা আধা ইংরেজিতে সে এসব প্রত্যাখ্যানের পর প্রায় একই কথা বরাবর বলে আসছে—ও, এটা তাহলে রাইট গুড হয়নি বুঝি? ঠিক আছে। নেক্স্ট স্টোরিতে কি করি দেখবে! ভর্মাজী পর্যন্ত স্টার্ট্ল হয়ে যাবে।

পরের বার অবশ্য সেই এক পরিণামই হয়েছে তার গল্পের।

একটু সহানুভূতির সঙ্গেই বলেছি, আচ্ছা জোয়ালা, তোমার এ বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া শখ কেন? দোকানের একটা তেমন তেমন গালিচা বেচলে একদিনে তোমার যা লাভ হবে সারা বছরে আমরা তা রোজগার করতে পারি না।

ছেড়ে দাও না ফ্রেণ্ড! জোয়ালা তাচ্ছিল্যভাবে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, গালিচা বেচে আমার লাভ হবে কেন? দোকান কি আমার?

আহা, তোমার না হয় তোমার চাচার তো। তুমিই তো তার ওয়ারিশন।

না না, আমি কেন হব! জোয়ালা প্রতিবাদ করেছে, ও রতনচাঁদকে দেখনি। চাচার ব্রাদর ইন-ল-র লেড়কা। চাচার যা কিছু সব ওই পাবে, দেখে নিও। পরমুহূর্তেই এ সব বাজে কথা যেন মন থেকে ঝেড়ে ফেলে জোয়ালা বলেছে, আর ইনহেরিট্ আমিই যদি করি তাতে কি! একটা গল্পের মত গল্প লেখার কাছে কিউরিও কি কার্পেট বেচে লাখ লাখ টাকা লাভ করাও কিছু নয়।

তাহলে তুমি আরেক কাজ কর না কেন? এবার সত্যিই অন্য ভাল পরামর্শ দিয়েছি, তুমি তোমার নিজের ভাষায়, মানে হিন্দীতে গল্প লেখ না কেন? সেটাতে তোমার হাত অনেক ভাল খুলবে।

হিন্দীতে জাসুসী গল্প! জোয়ালাপ্রসাদ বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে তার কঠিন সংকল্প জানিয়েছে, আমি বাংলায় লিখব, তুমি তা ছাপবে, আর দ্য গ্রেট পরাশর বর্মা তার তারিফ করবে দেখে নিও। এখন চল, একটা ভাল থ্রিলার ছবি এসেছে গ্লোবে। টিকিট করে এনেছি।

ওজর আপত্তি যা-ই করি জোয়ালাপ্রসাদের কাছ থেকে ছাড়া পাবার উপায় নেই। তার সঙ্গে কখনো ছবি দেখতে কখনো রেস্তোরাঁয় খেতে কখনো শুধু একটু তার মোটরে ঘুরে আসতে যেতেই হয়।

আগের কথাবার্তার নমুনা থেকেই বোঝা যাবে তার লেখা ছাপি বা না ছাপি সে আমার সঙ্গে 'তুমি' বলার মত ঘনিষ্ঠতা পাতিয়ে ফেলেছে। ঘনিষ্ঠ না হয়ে উপায়ও নেই। আমাদের সংসর্গে থাকবার জন্যে সে এত ব্যাকুল, আর কথায় বার্তায় ব্যবহারে তার আন্তরিকতা এত গভীর যে তাকে কষ্ট দিতে মায়াই হয়। তার লেখা ছাপতে পারি না বলেই তার অন্য অনুরোধ উপরোধ একটু আধটু না শুনে পারি না।

মানুষটা এমনিতে সব সময়েই হাসি খুশি। এক এক দিন শুধু চাপতে না পেরে মনের দুঃখটা প্রকাশ করে ফেলে।

তার দুঃখ হওয়াটা অবশ্য খুব অন্যায় নয়। অপুত্রক রামস্বরূপের ভাইপো হিসেবে সে-ই বংশে বাতি দেবার একমাত্র অধিকারী। অথচ দুঃখ এই যে তার চাচা রামস্বরূপ তাকে অকর্মণ্য মনে করেন।

সে নিজেই স্বীকার করে যে পাকা কাজের লোক সে নয়। চাচার এই পৃথিবী-জোড়া খ্যাতির কোম্পানি সে হয়তো তাঁর মত নিপুণ-ভাবে চালাতে পারবে না। কিন্তু তা বলে রতনচাঁদের মত ভণ্ড বকধার্মিক চোর তো সে নয়। নিজের ভাইপোর চেয়ে ওই শ্যালক পুত্র রতনচাঁদের ওপর চাচার বিশ্বাস অনেক বেশী। চাঁচা এমন অন্ধ যে তার বাইরের ভড়ং দেখেই ভুলে যান। এদিকে রতনচাঁদ যে চুরি করে তাঁর অমূল্য সব জিনিস লুকিয়ে পাচার করছে তা তিনি দেখতেই পান না।

চাচা হয়তো জোয়ালাপ্রসাদের ওপর অত উদাসীন হতেন না কিন্তু

ওই রতনচাঁদই কান ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে তাঁর মনটা অমন বিষাক্ত করে তুলেছে।

চাচা একটু চোখ খুলে রাখলে নিজেই অনেক কিছু বুঝতে পারতেন। কিছুদিন আগে পরাশর বর্মাকে যে পরামর্শের জন্যে ডেকেছিলেন তার দরকার হত না।

চাচা রামস্বরূপ অত্যন্ত হুঁশিয়ার কারবারী। বয়স তাঁর সত্তর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এই বয়সেও ভাঙা শরীর নিয়েও তিনি কারবারের যথাসম্ভব তদারকি করবার চেষ্টা করেন।

কিছুদিন আগে থেকে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে তাঁর অমূল্য কয়েকটা জিনিসের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তার মধ্যে একটা তুর্কি রেশমী রাগের দামই এখনকার শৌখিন সংগ্রাহকদের বাজারে লাখ টাকার বেশী।

এই সব ব্যাপার রামস্বরূপজী পুলিশে জানাতে চান না। পরামর্শের জন্যে তিনি তাই তখন পরাশর বর্মার শরণ নেন। পরাশরকে জোয়ালাপ্রসাদ সেই সময়েই প্রথম দেখে আর তার কীর্তিকলাপের কথা শুনে মুগ্ধ ভক্ত হয়ে ওঠে। জোয়ালাপ্রসাদের বাংলা শেখবার ঝোঁক হয়তো আগে থাকতেই ছিল, তবে বাংলায় গোয়েন্দা গল্প লেখার নেশা আর সেই সূত্রে আমার সঙ্গে আলাপের সূত্রপাত তখন থেকেই।

পরাশর রামস্বরূপজীকে কি পরামর্শ দিয়েছিল জানি না। তাতে প্রত্যক্ষ ফল কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। জোয়ালাপ্রসাদের কাছেই কিছুদিন আগে জেনেছি যে ওই ধরণের আরো দামী জিনিস পণ্ডিত ট্রেডার্সের দোকান থেকে এখনও প্রায় উধাও হচ্ছে।

পণ্ডিত ট্রেডার্স প্রথমে শুধু গালিচা র‍্যাগ ইত্যাদির দোকান ছিল, তারপর রামস্বরূপ নিজের বুদ্ধিতে আর চেষ্টায় সে ব্যবসাকে প্রায় আন্তর্জাতিক খ্যাতির বিরল কিউরিওর কারবার করে তুলেছেন। কার্পেট র‍্যাগ থেকে শুরু করে পাথর, হাতির দাঁতের জিনিস থেকে যে কোন হাতের কাজের শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য শিল্প নিদর্শনের জন্যে পণ্ডিত ট্রেডার্স বিখ্যাত। সস্তা চটকে ঠকাবার অজ্ঞ বিদেশী টহলদারদের নয়, দেশ বিদেশের এ সব জিনিসের সত্যিকার জহুরীরা তাই পণ্ডিত ট্রেডার্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

জোয়ালাপ্রসাদের কাছে তাদের কারবারের এই চুরি আর তার ওপর চাচা রামস্বরূপের বিরাগের কথা শুনে তাকে নিজেদের কারবারে আরেকটু মন দিতে বলেছিলাম। বলেছিলাম, তুমি তোমার চাচাজীকে কারবারে সাহায্য কর না বলেই নিশ্চয় উনি তোমার উপর বিরূপ। চেষ্টা করলে এই চুরির রহস্য তুমিও তো ফাঁস করে দিতে পারো। তুমি রোজ নিয়মিত দোকানে গিয়ে লক্ষ্য রাখলে হয়তো অনেক কিছু টের পেতে পারো, তোমার চাচাজীর পক্ষে যা জানা অসম্ভব। এই সব সূত্র আমাদের কাছে এসে জানালে পরাশরই তো তোমায় সাহায্য করতে পারে।

তা তো নিশ্চয় পারে! জোয়ালা উচ্ছ্বসিত উৎসাহে বলেছে, পরাশর বর্মা ভেদ করতে পারে না এমন রহস্য আছে নাকি কোথাও! কিন্তু...

কিন্তু,—বলেই আবার দমে গিয়েছে জোয়ালাপ্রসাদ। বিষণ্ণ মুখে বলেছে, কিন্তু কারবারের সকলকে যে হাত করে রেখেছে ওই রতনচাঁদ। আমি রোজ হাজিরা দিলেও কিছু ধরতে পারব কি!

পরমুহূর্তেই নিজের স্বভাবমাফিক সব দুঃখ দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হাসি মুখে বলেছে, যাক্ গে, আমার আর কি লোকসান ওতে হবে। কারবারটার ভার চাচাজী হয়তো ওকেই দিয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে একেবারে বঞ্চিত নিশ্চয় করবে না। আমার জন্যে সামান্য যদি কিছু বরাদ্দ করে দেয় তাই আমার যথেষ্ট। আমার তো মদ মেয়েমানুষের নেশা নেই। এই একটু খাওয়া দাওয়া বেড়ানো আর গাড়ি চালানো—এই হলেই আমি খুশি। আমার বেশী টাকার দরকার কি?

রতনচাঁদের টাকার খাঁকতি বুঝি খুব বেশী।—এবার ব্যাপারটা খানিকটা বুঝে জিজ্ঞাসা করেছি, মদ-টদ তো খায় জানি, অন্য বদখেয়ালও আছে?

জোয়ালাপ্রসাদ প্রথম কিছু বলতে চায়নি। ওসব যার যার নিজের ব্যাপার। ও নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না—বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়েই যেতে চেয়েছে। আমার পেড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত না জানিয়ে পারেনি যে রতনচাঁদের স্ত্রীলোক-ঘটিত বেশ গণ্ডগোলের ব্যাপার একটা আছে।

রতনচাঁদকে বারকয়েক পণ্ডিত ট্রেডার্সের শো-রুমেই ইতিমধ্যে দেখেছি।

সেখানে জোয়ালাপ্রসাদের জ্বালায় মাঝে মাঝে তার সঙ্গে যেতে হয়েছে। সেখানে রতনচাঁদের সঙ্গে সামান্য যা একটু আধটু দেখা আর আলাপ হয়েছে তাতে মনটা তার ওপর প্রসন্ন হয়নি।

জোয়ালাপ্রসাদের কাছে তার কথা না শুনলেও তাকে দেখে ও আলাপ করে খুশি হতাম বলে মনে হয় না। একটা অত্যন্ত দাম্ভিক হামবড়া ভাব। জোয়ালাপ্রসাদের বন্ধু বলে আমাদের ওপর অবজ্ঞাটা যে বেশী সেটা সামান্য দুটো কথায় আর মুখের ভাবে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করে। রতনচাঁদের বিদ্যাধরীকেও একদিন দেখবার সুযোগ মিলে গেল। বিকেলের একটা সিনেমা শোর পর জোয়ালা আমাদের জোর করে যে রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল সেটা বিশুদ্ধ ভোজনালয় নয়। পানাহার দুইয়েরই ব্যবস্থা সেখানে আছে।

জোয়ালার সেখানে আগে থাকতে রিজার্ভ করা টেবিল ছিল না। আমাদের তাই বাইরের দিকের একটা টেবিলেই বসতে হয়েছিল। খাবারের জন্যে অপেক্ষাও করতে হয়েছিল বেশ কিছুক্ষণ।

আমরা যেখানে বসেছিলাম তার সামনেই হলের উল্টো দিকে কয়েকটি কাঠের পার্টিশন দেওয়া ডাইনিং কেবিন।

আমরা বাইরের টেবিলে অপেক্ষা করতে করতেই হঠাৎ দরজার দিকে চোখ যাওয়ায় দেখলাম রতনচাঁদ নিভাঁজ ডিনার স্যুটে এক সঙ্গিনীকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকছে। সঙ্গিনীর দিকে চাইলে প্রথম পোশাক প্রসাধনই চোখে পড়ে, কিন্তু সে বাহার ছাড়িয়ে চেহারাটা লক্ষ্য করলে হতাশ হতে হয়। রংটাই ফর্সা এইমাত্র, নইলে রীতিমত কুৎসিতই বলা উচিত।

রতনচাঁদ এখানে যে বেশ পরিচিত ও সম্মানিত তা ডোর-ম্যানের কুর্নিশ করা আর হেড বয়ের সসম্ভ্রমে এগিয়ে যাওয়া থেকেই বুঝলাম।

আমাদের হয়তো রতনচাঁদ তখনও দেখতে পায়নি।

কিন্তু এর মধ্যে পরাশর অমন এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে বসবে কে জানত!

রতনচাঁদকে হেড বয় তখন তার কেবিনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে পরাশর সে প্রসেশনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে দু হাত তুলে নমস্কার করে বললে, নমস্তে রতনচাঁদজী। আপনার সঙ্গে কিছু বাত চিৎ ছিল। মেহেরবানি করে পাঁচ মিনিট যদি সময় দেন।

রতনচাঁদ মুখে স্পষ্ট ভ্রূকুটি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে পরাশরকে শুধু নয় আমাদের পর্যন্ত সে দেখতে যে পেয়েছে তা তার মুখের ভাব আরো কঠিন হয়ে ওঠাতেই বোঝা গেল।

চোখে মুখে সেই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য বিন্দুমাত্র গোপন না করে আপাদমস্তক পরাশরকে একবার যেন ঘৃণ্য কোন জীবের মত দেখে নিয়ে দাঁতে চিবানো বিরক্ত গলায় সে জানালে, দুঃখিত, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছাড়া আমি যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে কথা বলি না।

কথাটা বলেই সে সঙ্গিনীকে নিয়ে হেড বয়ের খুলে ধরা ফোল্ডিং ডোর দিয়ে তার কেবিনে গিয়ে ঢুকল। পরাশর যে পিছনে 'ও, আমিও দুঃখিত' বলে ভুল স্বীকার করলে তা কানে বোধহয় শুনল না।

পরাশর টেবিলে ফিরে আসবার পর খুব তিক্তভাবে তাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম মনে আছে। বলেছিলাম, তোমার কি সত্যি ভীমরতি ধরেছে, যেচে এ অপমান সইবার কিছু দরকার ছিল?

ছিল, ছিল। বলে হাসতে হাসতেই পরাশর তার সীটে বসে বলেছে, অপমান যে করবে তা তো জানতামই। কিন্তু এ সুযোগ না নিলে ওঁর মোহিনীটিকে এত ভাল করে দেখতে পেতাম!

কি দেখলে কি—আমি তখনও ঝাঁঝের সঙ্গে বলেছিলাম, দেখবার কিছু আছে! একেবারে তো জলার পেত্নী।

আচ্ছা, সেইটাই তো দেখবার—পরাশর তবু তার ভুল স্বীকার করেনি, —রতনচাঁদজীর রতন চেনবার চোখটি কি রকম তা তো জানা দরকার।

তার আরাধ্য হিরো পরাশর বর্মার এ অপমানে জোয়ালা তখন মরমে মরে গিয়েছে। প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে সে বলেছিল, তবু কেন ওই ছোটলোকটাকে এ সুবিধে দিলেন বর্মাজী? ঊর্মিলাকে দেখাই যদি আপনার ইন্‌টেনশন ছিল তাহলে আমায় বললে আমি তো আপনাকে ভাল করে আমাদের শো-রুমেই দেখিয়ে দিতে পারতাম।

মেয়েটির নাম বুঝি ঊর্মিলা! আমিই অবাক হয়ে বলেছিলাম, কিন্তু তোমাদের শো-রুমে! ঊর্মিলাও সেখানে একটা কিউরিও নাকি? কই আমাদের তো চোখে পড়েনি এপর্যন্ত?

ঊর্মিলা অফিসের অ্যাকাউণ্টসে কাজ করে—জোয়ালাপ্রসাদ বুঝিয়ে দিয়েছিল, শো-রুমের পিছনে সে অফিস। আমি অবশ্য পারচেজের

হিসাব জানবার ভাণ করে তোমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারতাম অনায়াসে।

নিয়ে যাওনি বলে ধন্যবাদ। আমি হেসে বলেছিলাম, ওরকম কিউরিওতে আমার টান নেই। পরাশরই ওসবের কদর বোঝে।

পরাশর কিন্তু এসব ঠাট্টার খোঁটা গ্রাহ্য না করে বেশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিল, উর্মিলা তোমাদের অ্যাকাউণ্টসে কাজ করে?

তাইতেই ওর দাম বেড়ে গেছে বোধহয়। বলে আমি হেসেছিলাম।

জোয়ালাপ্রসাদের কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্কই হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হওয়ার পর মনে হল গাড়িতে তো বেশ খানিকক্ষণই আগেই চড়েছি, এখনো জোয়ালাপ্রসাদের বাসায় পেঁছাতে পারলাম না! এ গাড়ি কোথায় তাহলে চলেছে? কতদূরে বাসা নিয়েছে জোয়ালাপ্রসাদ!

ড্রাইভারকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম, তুমি যাচ্ছ কোথায়? সমস্ত ছাড়িয়েই চলে যাচ্ছ যে।

আজ্ঞে তিনি শহরের বাইরেই থাকেন যে! ড্রাইভার জবাব দিলে।

শহরের বাইরেই থাকেন? দাঁড়াও দাঁড়াও!

এবার কথাগুলো আমার নয় পরাশরের। গাড়ি তখন শহরের অন্য প্রান্তের কাছাকাছি একটা বাজারগোছের জায়গার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

খুব বড়মানুষী এলাকা নয়। পুরনো ধরনের বাড়ি ঘর দোকান। বাড়িঘর থেকে সব কিছুতে ইসলামী প্রভাবটা খুব অস্পষ্ট নয়।

এখানে হঠাৎ গাড়ি থামাতে বলার মানে কি?

মানে যখন বোঝা গেল তখন আমি শুধু নয় ড্রাইভার পর্যন্ত তাজ্জব।

গাড়ি থামাবার পর তা থেকে পরাশর একা নেমে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা দোকানে গিয়ে দাঁড়াতে প্রথমটা তার উদ্দেশ্যটা জানতেই পারিনি।

যেখানে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা একটা ঘুড়ি লাটাই-এর দোকান। এ সব দোকান সাধারণত যেমন হয় তেমনি নেহাত ছোট পানের দোকানের মত একটু উঁচু পাটাতনের ওপর পাতা, দোকানের চারি-দিকে রঙীন ঘুড়ি লাটাই আর ঘুড়ির কাগজে সাজানো।

পাড়াটা এ অঞ্চলের পতঙ্গ-বিলাসী-ছেলেদের। এ রকম ঘুড়ির দোকান এই রাস্তায় ঢোকবার পর আরো কয়েকটা দেখেছি।

পরাশর সে দোকানে কোন কিছু খবর জানতে নেমেছে ভেবে তার পিছু পিছু সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সেখানে তার কথাবার্তা শুনে নিজের কানকেই বিশ্বাস করব কিনা ভেবে পেলাম না।

পরাশর সে দোকানে দরাদরি করে ঘুড়ি লাটাই কিনছে।

আর কিনল যা সে কি একটা ঘুড়ি! নানা রঙের ঘুড়ি পুরো এক কুড়ি তো বটেই, তার সঙ্গে দুটো বড় ছোট লাটাই আর যা সুতোর বাণ্ডিল, তাতে মনুমেণ্ট থেকে পরেশনাথের মাথা পর্যন্ত চার দফা ঘুড়ি ছোঁয়াবার কাজ সেরেও কিছু ফাউ থাকে।

ঘুড়ির দোকানদারের যে খুশি ধরে না তা বলাই বাহুল্য। সে নিজে তার এক অনুচরের সঙ্গে সেই ঘুড়ির সুতোর রাশ আকর্ণ বিস্তৃত হাসির সঙ্গে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

হাসিটা শুধু তার হঠাৎ দাঁও মারার সৌভাগ্যের জন্যে তা বোধহয় নয়। পরাশরের মত এমন একটা সৃষ্টিছাড়া পাগল স্বচক্ষে দেখার গর্বও তার ভেতর বোধ হয় মিশেছিল।

সেই মালের রাশ নিয়ে গাড়ি ছাড়বার পর একটু বিরক্ত মুখেই পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ব্যাপারটা কি বল তো, হেড অফিসে কি সত্যি সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে! কেন উর্দু কাগজের উড়ো খবর পেয়ে ভিকারাবাদে এসেছিলে! তারপর ফিরে যেতে যেতে বিপন্ন বন্ধুর ডাক শুনে এখন তার কাছে চলেছ। তার মধ্যে এ সব ঘুড়ি লাটাই নিয়ে কি করবে?

কি করব? পরাশর যেন বেশ একটু ফাঁপরে পড়ে প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল।—মানে ওগুলো দেখে হঠাৎ বড় লোভ হল। এত ভাল ঘুড়ি অনেক দিন দেখিনি কি না!

ভাল ঘুড়ি দেখে কিনে ফেললে? রেগে বললাম, ঘুড়ি কি খাবার, না দেয়ালে টাঙিয়ে সাজিয়ে রাখবার জিনিস? ঘুড়ি ছোটরা ওড়ায়। তুমি কি ওগুলো ওড়াবার জন্যে কিনেছ?

তা ওড়ালে ক্ষতি কি! পরাশর এবার যেন মরিয়া হয়ে স্বীকার করে বললে, এ তো বিদেশ বিভুঁই, এখানে কে কি বলবে তার জন্যে পরোয়া না করলেও চলবে। তাছাড়া জোয়ালাপ্রসাদ যে বাড়ি নিয়েছে

সেটা শুনছি শহরের বাইরে। তাই একটু ঘুড়ি যদি ওড়াই তাতে দোষ তো কিছু নেই।

না তা নেই, পরাশরের যুক্তির বহরে এবার হেসে ফেলেই বলতে হল, কিন্তু যাচ্ছ এক বন্ধুর বিপদ সামলাতে, ঘুড়ি ওড়াবার সময় তুমি পাবে?

সময় যে কি পরিমাণ পাওয়া যাবে তখনই যদি জানতে পারতাম। এর পরে যা ঘটবে তার কতটুকু বা অনুমান করতে পেরেছি?

পারলে আগে থাকতে কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করা যেত! না বোধহয়। কারণ এর পরের ঘটনার ধারা পরিণতিটা এমন যে, অবাধে তা বইতে না দিলে নিজের সমস্যা সমাধানের পথই বার করতে পারত না।

বিকেলের দিকে স্টেশন থেকে বেরিয়েছিলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে শহরের বাইরে জোয়ালাপ্রসাদের এখানকার আস্তানায় গিয়ে পেঁছিলাম।

বেশ ফাঁকায় বাগান ঘেরা পরিচ্ছন্ন একটি বাংলো গোছের বাড়ি। নির্জনে শান্তিতে থাকবার পক্ষে বেশ চমৎকার জায়গা।

কিন্তু এই ভিকারাবাদে জোয়ালাপ্রসাদ স্বাস্থ্যোদ্ধার কি নির্জন বাসের জন্যে নিশ্চয় আসেনি। শহর থেকে দূরে এ রকম একটা বাড়ি সে থাকবার জন্যে ঠিক করলে কেন?

গাড়িটা বাড়ির হাতায় ঢোকবার সময় সবচেয়ে কৌতুক বোধ করলাম পরাশরের কথা ভেবে। তার ঘুড়ি ওড়ানোর শখ মেটাতে হলে এখানে বাগানে দাঁড়িয়েই শখ মেটাতে হবে। ঘুড়ি ওড়াবার ছাদ এ বাড়ির নেই। বাংলো বাড়ির যেমন হয় তেমনি বাহারে টালিতে ছাওয়া দুদিকে গড়ানো ছাদ। হাতা দিয়ে ঢুকে বাংলো বাড়ির গাড়িবারান্দায় মোটরটা আসবার পর তা থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মনোভাবটা ঠিক প্রসন্ন কৌতুকের আর রইল না। তখন থেকেই কেমন একটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করলাম। যে অস্বস্তির কারণটা জোয়ালাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা হবার পর কিছুটা অন্তত স্পষ্ট হল।

গাড়ি এসে থামবার পরেই আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে দুজনকে গাড়িবারান্দার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

তাদের একজন এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরেছিল। আরেকজন

আমরা নেমে আসার পর ইঙ্গিত করে দুজন অনুচরকে ডাকিয়ে পরাশরের কেনা ঘুড়ির কাঁড়ি সমেত আমাদের মালপত্র নামাবার ব্যবস্থা করে আমাদের বেশ খাতির করে জোয়ালাপ্রসাদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

বাংলোটি খুব ছোটখাট নয়। মাঝখানের হল আর বেশ কয়েকটা কামরা পেরিয়ে জোয়ালাপ্রসাদের ঘরে পৌঁছেছিলাম।

আমাদের আনতে গাড়ি পাঠিয়েও কেন যে সে নিজে বাইরে আমাদের নামবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকেনি তা বোঝা গিয়েছিল ঘরে ঢুকেই।

জোয়ালাপ্রসাদ সেখানে একটি বিছানায় তাকিয়া বালিশ হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত। অভ্যর্থনার জন্যে যে লোকটি সঙ্গে এসেছিল ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই সে নমস্কার করে চলে গেল।

আমরা তারপরই ব্যস্ত হয়ে জোয়ালাপ্রসাদের বিছানার ধারে আমাদের জন্যে দুটি ছোট চৌকি গোছের আসনে গিয়ে বসলাম।

কি ব্যাপার কি জোয়ালাপ্রসাদ? আমার তখন আর ধৈর্য ধরবার অবস্থা নেই, তুমি এখানে বিছানায় শুয়ে! আবার বিপদে পড়ে আমাদের ডাকিয়ে এনেছ—এ সবের মানে কি?

একটু আস্তে দোস্ত! জোয়ালাপ্রসাদের মুখে একটু বিষণ্ণ হাসি—এক এক করে সবই বলছি। বলবার জন্যেই ডাকিয়ে এনেছি। তবে তোমাদের যে আসতে দেবে সে আশা করিনি।

সে আশা করনি! সবিস্ময়ে বললাম, এ তো আরেকটা রহস্য আগের তালিকায় যোগ হল। বেশ এক এক করে সব কটার জবাব দাও।

সবার আগে এ বাড়িতে কবে থেকে বন্দী সেই কথাটা জানাও।—পরাশর এ অদ্ভুত প্রশ্নটা করে আমাকেও অবাক করে দিলে।

এ বাড়িতে বন্দী কি রকম? আমি সবিস্ময়ে পরাশরের দিকে তাকালাম।

কি রকম তা জোয়ালাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা কর! জবাব দিলে পরাশর।

বিমূঢ় হয়ে একবার পরাশর আর একবার জোয়ালার দিকে তাকিয়ে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, আমার বুদ্ধি একটু মোটা, ব্যাপারটা আমায় বুঝিয়ে দেবে?

বুঝিয়ে দিচ্ছি। জোয়ালাপ্রসাদ একটু হেসে এবার বললে, তবে বুদ্ধি তোমার মোটা নয় মনটা একটু বেশী সরল। নইলে ভর্মাজি

যা লক্ষ্য করেছেন তুমিও নিশ্চয় তা করেছ।

হঠাৎ অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়ে এবার জোয়ালাকে বললাম লক্ষ্য করবার জিনিস মানে তোমার এই অনুচরদের কথা বলছ? আমাদের অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে যারা গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল?

জোয়ালা ও পরাশর দুজনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে সত্যি চিন্তিতভাবে বললাম, দুজনকেই, না শুধু ওদের দুজনকেই কেন, আমাদের মালপত্র যারা নামাল সেই চাকর-বাকরদের পর্যন্ত কেমন একটু বেশী চোয়াড় গুণ্ডা গোছের লেগেছে সত্যিই। সব যেন কোন জেলখানা থেকে বার করে এনে কাজে লাগানো হয়েছে। কেমন একটা অস্বস্তি প্রথমেই তাই মনে হয়েছিল, তবে সেটার অর্থ এমন সাংঘাতিক তা ভাবতে পারিনি।

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু এখানে আমাদের যে আসতে দিয়েছে, তোমার সঙ্গে অবাধে যে কথা কইছি এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে?

তোমাদের আসতে ও আমার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়াও ওদের ষড়যন্ত্রের একটা প্যাঁচ বলেই বোধহয়। বলল জোয়ালাপ্রসাদ, আমাদের বাংলা কথা অবশ্য ওরা কেউ বোঝে না।

ওরা, ওরা বলছ? এই ওরা কারা? তোমায় বন্দী করে এখানে রাখা কাদের ষড়যন্ত্র? বিমূঢ় ভাবে জোয়ালার দিকে তাকালাম।

কাদের নয়! বল কার—জোয়ালাপ্রসাদ ধীর ধীরে অত্যন্ত হতাশ ভাবে বললে, যার কৌশলে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি, এ বাড়ি যার চক্রান্তে অসন্দিগ্ধ ভাবে ভাড়া নিয়ে কার্যত বন্দী হয়ে আছি, এমন কি, আমার এই অসুখটার মধ্যে যার হাত আছে বলে আমার ধারণা সে কে এখনো বুঝতে পারছ না?

রতনচাঁদ! আমি প্রায় ধরা গলায় উচ্চারণ করলাম, এখানে পর্যন্ত সে তার জাল ছড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু কেন?

কেন সেটা বোঝা কিছু শক্ত নয়—বললে জোয়ালাপ্রসাদ, কিন্তু তার জাল যে এতদূর পর্যন্ত এমনভাবে ছড়ানো হতে পারে সেইটেই কোনমতে কল্পনাও করতে পারিনি। গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটা বললেই বুঝতে পারবে। জোয়ালাপ্রসাদের ধারাবাহিক ভাবে তার ভিকারাবাদ অধ্যায়ের বিবরণ বলা কিন্তু পরাশরের পছন্দ হল না।

তোমায় একটানা সব কিছু বলতে হবে না। তার সময় না-ও মিলতে পারে। পরাশর বললে, বরং আমরা যা প্রশ্ন করে যাচ্ছি তুমি তার উত্তর দিয়ে যাও।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে পরাশর। আমি সমর্থন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি হঠাৎ এ ভিকারাবাদে কেন, সেইটে আগে বল।

ভিকারাবাদে আমায় পাঠানো হয়েছে বলে। বললে জোয়ালাপ্রসাদ, আদেশটা কড়া ভাবে চাচাজীই দিয়েছেন, কিন্তু তার পেছনে মন্ত্রণাটা সম্পূর্ণভাবে রতনচাঁদের। চাচাজীর এ রকম অসুখের সময় আমায় এখানে পাঠানোর মধ্যে অনেক কিছু মতলব আছে।

তোমার চাচাজী, মানে রামস্বরূপজীর অসুখ! পরাশর উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, কবে থেকে?

তা আমি আসবার অন্তত সাতদিন আগে থেকে। জোয়ালাপ্রসাদ একটু মনে করে নিয়ে বললে, বুড়ো হয়ে ভুগছেন অনেকদিনই, কিন্তু রোগটার বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে ওই সময় থেকে।

এই অসুখের মধ্যেও তিনি তোমায় এই ভিকারাবাদে আসতে হুকুম করলেন! অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

তোমরা যে জন্যে এখানে এসেছ, সেই জন্যে। এবার জোয়ালার মুখে একটু ম্লান হাসি দেখা গেল, দর্পণা দেবীর পুজো দিয়ে দেওয়ানী দেবীর কাছ থেকে চাচাজী যা জানতে চান তা জেনে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছেন। আর চাচাজীর কি জিজ্ঞাসা তা ভাবতেও পারবে না বোধহয়।

একটু বোধহয় পারি—জানালে পরাশর, তাঁর নিজের অসুখ-বিসুখ পরমায়ুর কথা নয়, তোমাদের কারবার সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন মনে হয়।

হ্যাঁ, জোয়ালা পরাশরের সঠিক অনুমানটাই বিস্তারিত করে বোঝালে, বর্মাজীকে যে জন্যে চাচাজী একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমাদের কারবারের সে রহস্যজনক চুরি বন্ধ হয়নি। সেই থেকে সমানে চলছে। একটা দুটোর খবর মাত্র খবরের কাগজে বার হয়েছে। দু-একটার পর চাচাজীর হুকুমে এসব খবর বার করা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চাচাজী এ ব্যাপার নিয়ে পুলিশে যেতে নারাজ। রতনচাঁদ নিজের স্বার্থেই নিশ্চয় তাঁকে বুঝিয়েছে যে পুলিশকে এ সব ব্যাপারে ডাকলে জানাজানি হয়ে কারবারের ক্ষতি হবে।

পুলিশ, গোয়েন্দা এসবের বদলে তোমার চাচাজী এ রহস্যের মীমাংসার জন্যে এই দেওয়ানীর কাছে পাঠিয়েছেন? আমার গলার বিদ্রূপটা অস্পষ্ট না রেখেই বললাম, তোমাদের চোরাই সব মালের কিনারা হয়ে যাবে এই বুজরুকির ঘাঁটিতে।

বুজরুকি বোলো না। পরাশর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলে, তোমার নিজের কি হয়েছিল সেটা মনে কর, মনে কর আমাদের যাওয়াটা ঠিক বন্ধ হবার ব্যাপারটা, তা ছাড়া বদ্রীদাস যা সব বলেছে সেগুলোর কথাও মনে রেখো।

তুমি যাই বল, আমি জোরের সঙ্গে বললাম, আমি তোমাদের দেওয়ানীর সমস্ত কাণ্ডকারখানাই বুজরুকি বলে মনে করি। আমি তার কোন ক্ষমতায় বিশ্বাস করি না।

আমিও করি না। জোয়ালাপ্রসাদ আমায় সম্পূর্ণ সমর্থন জানালে, মেয়েটা একেবারে পয়লা নম্বরের ঠগী। আমি অত্যন্ত দুঃখিত বর্মাজী। সত্যিই আমি ভেবে পাচ্ছি না আপনার মত মানুষ নিজের চোখে দেখেও কি করে ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করে। আমি তো এখনো চোখেই দেখিনি, তবু.....

চোখেও দেখনি? কথার মাঝখানেই তাকে থামিয়ে পরাশর বললে, চোখে দেখলে আমার মতই বিশ্বাস করতে। কিন্তু চাচাজী পাঠানো সত্ত্বেও তুমি এখনো দেওয়ানী দেবীকে চোখে দেখনি কেন?

সেইটিই অদ্ভুত ব্যাপার বর্মাজী। জোয়ালাপ্রসাদ দুঃখের সঙ্গে জানালে, এর পেছনেও রতনচাঁদের হাত আছে বলে মনে করি। প্রথম এখানে আসবার পর অনেকবার চেষ্টা করলেও দেওয়ানী দেবী আমার সঙ্গে দেখা করতেই চায় নি। তারপর আমি তো নিজেই অসুস্থ হয়ে শয্যাগত হয়ে আছি। তোমাদের সাহায্য এই জন্যেই আমাদের দরকার।

সাহায্য যা দরকার করব। আশ্বাস দিয়ে বললে পরাশর, কিন্তু একটা কথা যদি জানো তো আগে বল। তোমার চাচাজী এই রকম একটা অজানা দূর মফঃস্বলে দেওয়ানীর মত একজন জাতিস্মর ভূত-ভবিষ্যৎ-জানা মেয়ের কথা কবে কি করে জানলেন?

আজ তো নয়, জোয়ালা আমাদের অবাক করে বললে, তিনি তো অনেক কাল আগে থেকেই দেওয়ানীর এই সব অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জানেন, আর দেওয়ানীকে তো জানেন তার জন্মের আগে থেকেই।

তার মানে? আবোল তাবোল বকছে ভেবে একটু সন্দিগ্ধভাবেই জোয়ালাপ্রসাদের দিকে তাকালাম।

মানেটা বুঝিয়ে দিলে জোয়ালাপ্রসাদ। বললে, দেওয়ানীরা তো আদিতে কাশ্মীরী পণ্ডিত। আমরাও তাই। দেওয়ানীর গণক পরিবারের সঙ্গে চাচাজীর তাই অনেক আগে থেকেই জানাশোনা। ওঁরা অনেককাল থেকেই পরাশরের খোঁজ-খবর নিয়ে যোগাযোগ রেখেছেন।

হুঁ, বলে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভেবে নিয়ে পরাশর এবার বললে, এখন তুমি কি সাহায্য আমাদের কাছে চাও বল।

আমার তো এখনো বিছানা থেকে ওঠা বারণ। জোয়ালাপ্রসাদ বললে, আর সুস্থ থাকলেও দেওয়ানী আমার সঙ্গে দেখা করবে না। আপনারা মানে বিশেষ করে কৃত্তিবাসের কথা বলছি, ও যদি দেওয়ানীর সঙ্গে দেখা করে আমার হয়ে চাচাজীর প্রশ্নের উত্তরগুলো জেনে আসে!

বিশেষ করে আমার কথা বলছ কেন? গলাটা খুব প্রসন্ন রাখতে পারলাম না, তোমার হয়ে আমি গেলে দেওয়ানী দেবী দেখা করে সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন, এ কথা মনে করছ কেন?

করছি মানে,—জোয়ালার মুখে একটু হাসির আভাস যেন দেখলাম—দেবীকে তোমার ওপর একটু বেশী প্রসন্ন শুনলাম কি না!

জোয়ালার কথায় পরাশরের মুখেও সেই হাসির প্রতিফলন দেখে বেশ গরম হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সঙ্গে দেওয়ানী তো দেখা করতেই চায়নি বলছ। আমার সম্বন্ধে এ খবর তাহলে শুনলে কি করে?

আহা, দেখা করতে পারিনি বলেই তো তোমাদের খবর জানতে পারলাম বদ্রীনাথের কাছে।—জোয়ালা জানাল, তার কাছে খবর না পেলে এমন শেষ মুহূর্তে তোমাদের স্টেশনে ধরে এখানে আনাতে পারি!

আনিয়ে কিছু লাভ হবে কি না জানি না। পরাশর বেশ চিন্তিত ভাবে বললে, তবে একের জায়গায় তিন মাথা একসঙ্গে লাগালে হয়তো উপায় কিছু বার হতে পারে। কাল কৃত্তিবাসকে নিয়ে একবার মতিকোঠিতে গিয়ে দেখব।

মতিকোঠিতে যাওয়া কিন্তু আমাদের হল না। বাংলোবাড়ির বাগানের

মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াবার বাধা না থাকলেও আমরা যে বন্দী, পরের দিন মতিকোঠিতে যাবার প্রস্তাবেই বুঝতে পারলাম।

প্রথম এখানে নামবার সময় যাদের অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম তাদের দুজনের নাম মূলরাজ আর পুর্তু। এ বাংলো বাড়ি আর তার সংগে এখানকার ভাড়াটিয়াদের দেখাশোনা করার ভার তাদের ওপর।

এ বাড়ির আসবাব-পত্রের মত আনুষংগিক অনুচর হিসাবে যাদের থাকবার কথা তারাই জোয়ালাপ্রসাদের বেলা কয়েদখানার জমাদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মূলরাজই প্রধান। পরের দিন সকালে তার কাছে আমাদের ইচ্ছেটা জানাতে এক কথায় যে রকম সসম্ভ্রমে সে সম্মতি জানালে তাতে তার শয়তানী মতলবটা কল্পনা করতেও পারিনি।

বেলা নটার মধ্যে আমাদের রওনা হবার কথা। সাড়ে নটা বাজতেও জোয়ালার গাড়ি না আসাতে জোয়ালার চেয়ে আমরাই বেশী অস্থির হয়ে উঠলাম। বাংলোর এক কোণে একটা ছোট অফিস ঘরে মূলরাজ বসে। শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে তাগাদা দিতে হল।

গাড়ি এখনও আসেনি! মূলরাজ ব্যস্ত হয়ে নিজেই খবর নিতে বেরিয়ে গেল। সেই যে গেল আর তার দেখা নেই। গাড়ি তো এলই না, কারুর কাছে কোন খবরই পাওয়া গেল না।

বেলা এগারোটা নাগাদ রাগ করে নিজেই টাংগা গোছের কিছু ভাড়া করবার জন্য বাইরে যেতে গিয়ে আমাদের সত্যকার অবস্থাটা বুঝতে পারলাম। বাইরে বেরুবার লোহার প্রকাণ্ড গেটে তালা দেওয়া।. সে তালার চাবি কার কাছে কেউ জানে না। মূলরাজ নেই। তার নিচের লোক পুর্তু বোবা হয়ে শুধু অসহায়তার ভংগিই করল।

জোয়ালাপ্রসাদকে গিয়ে সব কথা বলতেও হল না এরপর। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখেই সে হতাশ মুখে বললে, বেরুতে পারলে না তাহলে? গাড়িও নেই? বাইরের গেটেও তালা বন্ধ! এতটা করবে ঠিক বুঝতে পারিনি।

কিন্তু বোঝা উচিত ছিল। কঠিন মুখে বললে পরাশর, কাল তোমার ডাক্তারকে দেখেই আসল চেহারা আর লুকোনো থাকবার কথা নয়।

পরাশর ভুল কিছু বলেনি। গতকাল জোয়ালাপ্রসাদকে যে দেখতে

এসেছিল সেই ডাক্তারই এক হিসাবে তার শত্রুদের মতলবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

লোকটা যে পুরোপুরি জাল তা ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে তার ঢোকার ধরন থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। যে ভাবে বুকে স্টেথিস্কোপ লাগিয়েছিল আর বিশেষ করে প্রেসার মাপবার জন্যে হাতে রাবার টিউব বেঁধেছিল তাতে শুধু আনাড়িই নয়, ডাক্তারী সম্বন্ধে একেবারে গণ্ডমূর্খ বলে বুঝতে দেরী হয়নি।

তার ওই পরীক্ষা শেষ হবার পর পরাশর যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি দেখলেন ডাক্তারসাব? এবার একটু চলাফেরা করতে পারবে? নেহি—নেহি—ডাক্তার প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল, আভি এক মাহিনা অ্যায়সা রহনা পড়েগা। নেই তো হার্ট ফাঁস যায়েগা।

হার্ট ফাঁস যায়েগা? পরাশর কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে কি করে মুখটা গম্ভীর রেখেছিল সে-ই জানে। আমারও হাসি চাপা যেমন শক্ত হয়েছিল তেমনি হয়েছিল জাল ডাক্তারের কানটা ধরে একটু নেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে।

আজ কিন্তু হাসির বদলে রীতিমত রাগেই গা জ্বলে যাচ্ছিল।

এই ভিকারাবাদে এসে এমন একটা বাড়ি তুমি কি বলে ভাড়া করলে!—জোয়ালার ওপরই রেগে উঠলাম, একটু দেখে শুনে নিতে পারোনি?

দেখতে শুনতে এ বাড়ি কি অপছন্দ হবার? জোয়ালা দুঃখের হাসি হাসল, তা ছাড়া বাড়িটার খবর ওই মতিকোঠি থেকেই পেয়েছিলাম যে! এখানে বাসা খুঁজছি শুনে ওই বদ্রীদাসই খবর দিয়েছিল!

বদ্রীদাসই দিয়েছিল! আশ্চর্য তো—পরাশর একটু চুপ করে থেকে কি যেন একটা ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু এ বাড়ির ব্যাপারটা একটু বোঝবার পর এখান থেকে অন্য কোথাও যাওনি কেন? চাচাজীকে সব কথা জানিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতেও তো পারতে!

না না, তা পারতাম না। চাচাজীকে সব জানিয়ে চিঠি আমি দিয়েছিলাম। সে চিঠি তিনি যে পেয়েছিলেন এই টেলিগ্রাফটাই তার প্রমাণ।—বিছানার ওপাশের একটা ছোট টেবিলের ওপর থেকে একটা টেলিগ্রাফের কপি পরাশরের হাতে দিয়ে জোয়ালা বললে, কিন্তু পড়ে দেখুন টেলিটা।

পরাশর পড়ে আমার হাতে দিল। বেশ কিছুকাল আগের টেলিগ্রাম। পর পর একগাদা পোস্টাফিসের স্ট্যাম্পের ছাপ পড়ে ধ্যাবড়া কালির দাগে তারিখ-টারিখ সব মুছে গেলেও সংক্ষিপ্ত বার্তাটা ঠিক মতই পড়া যায়।

DONT RITURN IF NOT FACTS--CHACHAJI

যেমন ইংরেজি তেমনি বানান। তবে মানেটায় কোন অস্পষ্টতা নেই। —যা জানতে পাঠিয়েছি তা না জেনে ফিরো না—এই হল চাচাজীর আদেশ।

যাই থাক এ টেলিগ্রামে—পরাশর একটু ভেবে ভেবে বললে, তোমার চাচাজীর যে রকম অসুখ বলছ, তাতে জোর করে চলে গিয়ে সেখানেই তোমার এখন থাকা উচিত নয় কি?

সেই থাকাটা বন্ধ করবার জন্যেই তো এই বন্দী রাখার ব্যবস্থা। তিক্ত ভাবে হাসল জোয়ালাপ্রসাদ।

এ সময়ে তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়া কেউ একজন তাহলে চাইছে না—বলে গম্ভীর হয়ে একটু ভেবে নিয়ে পরাশর বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললে, ঠিক আছে, উপায় একটা বার করতে হবে।

উপায় একটা বার হল ঠিকই। বাংলো বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের ঘোরাফেরার কোন বাধা নেই। দিনের বেলা নয়, গভীর রাতে সাবধানে চারিদিকে টহল দিতে দিতে পরাশর একদিন দরজাটা আবিষ্কার করল।

বাংলো বাড়ির বাগান শুদ্ধু ঘেরা সাত হাত উঁচু জেলখানার মত দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায় নেহাত ছোট একটা পুরোনো দরজা। এক কালে এই দিকটায় একটা আস্তাবল গোছের ছিল বোধহয়। সে আস্তাবলের ঘোড়া সহিসের সহজে বাইরে যাবার জন্যে দরজাটা বোধহয় ব্যবহার করা হত।

আপাতত বহুদিন ধরে সে দরজা বন্ধ হয়ে শ্যাওলায় আর বুনো লতাপাতায় প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে।

ভাগ্যের কথা দরজাটা একটু কষ্ট করার পর খুলতেও পারা গেল। বার হবার রাস্তা একটা পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে জোয়ালা এখানকার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে তার গাড়িটাও বাইরে এক জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করল।

বাংলো বাড়ির অন্য লোকজন যা-ই হোক ড্রাইভার যে তাদের দলে নয়, মতিকোঠিতে যাওয়া বন্ধ হবার পরদিনই তা জানা যায়। ড্রাইভার রঙ্গলাল এক সময়ে গোপনে তার নিরুপায় অবস্থাটা জানিয়ে দিয়েছিল।

সেই থেকে তার সঙ্গে গোপন পরামর্শে সব আয়োজন করে একদিন গভীর রাত্রে বাংলো বাড়ি থেকে পালালাম।

ইতিমধ্যে রীতিমত চাঞ্চল্যকর ও প্রায় অবিশ্বাস্য আর একটা খবর আমরা বাংলো বাড়ি থেকেই পেয়েছি। মতিকোঠি থেকে কদিন আগে স্বয়ং দেবযানীই নাকি নিরুদ্দেশ! সেখানে ভক্তদের আর যেতে দেওয়া হচ্ছে না। মতিকোঠির দরজাতেই ভারী ভারী তালা পড়েছে।

বাংলো বাড়ি থেকে গভীর রাত্রে যথাসম্ভব সন্তর্পণে বার হবার সময়ে লক্ষণ-টক্ষণ দেখে ভাগ্যটা আমাদের ভাল বলেই মনে হল। জোয়ালাকে নিয়ে নিজেরাই নিজেদের লাগেজগুলো যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য বয়ে নিয়ে বাগানের ভেতর থেকে দরজা দিয়ে বেশ নির্বিঘ্নেই বার হতে পারলাম।

বার হবার ব্যাপারে পরাশরই যা একটু ঝামেলা বাধিয়েছিল। নিজেদের মোটঘাট নিয়েই আমরা নাকাল, তার ওপর পরাশর আবার তার ঘুড়ি লাটাই-এর বোঝা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। তার ভাবখানা এই যে সুটকেশটা ফেলে যেতে হলেও ঘুড়ি লাটাই ছেড়ে যেতে সে রাজী নয়।

মোটঘাটের সঙ্গে সেই ঘুড়ি-লাটাই-এর বোঝা সামলাতে গিয়েই নিচু দরজা দিয়ে বার হবার সময়ে হোঁচট খেয়ে দরজার একটা পাল্লায় সে এমন ধাক্কা দিলে যে সেটা সশব্দে বন্ধ হয়ে সারা এলাকাটাই যেন কাঁপিয়ে দিলে।

আমাদের বুকগুলো তখন একেবারে হিম হয়ে গেছে।

দরজার পাল্লার শব্দ হওয়ার পর বাংলো বাড়ির ভেতরে মূলরাজের থাকবার ঘরের আলোটা তখন জ্বলে উঠেছে।

কাঠ হয়ে কয়েক ঘণ্টার মত লম্বা কটা সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু ওই পর্যন্তই! মূলরাজের ঘরের আলোটা আবার নিভে গেল।

কিছুক্ষণ আরো অপেক্ষা করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিরাপদেই আমরা

নির্জন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা জোয়ালার গাড়িটায় গিয়ে উঠতে পারলাম।

কোথায় যাওয়া হবে এইবার এই প্রশ্ন।

একটু আলোচনায় ঠিক হল যে রেল স্টেশনে যেতে হলেও ভিকারাবাদে কিছুতেই যাওয়া চলবে না। তার বদলে আরো দূরের ছোট কোন স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করা হবে বলেই স্থির হল।

ভিখারাবাদের আগে যে স্টেশন সেখানে যেতে হলে শহরের ভেতর দিয়ে খানিকটা যেতে হয় বটে কিন্তু এখন মাঝরাতে এ দূর মফস্বলী শহর শ্মশানের মতই নির্জন। জোয়ালার গাড়ি নিস্তব্ধ নির্জন রাস্তায় সামান্য একটু শব্দের ঢেউ তুলে এগিয়ে চলল।

রাতটা অন্ধকার। শহরের দু-একটা রাস্তায় ছাড়া ভাল ভাবে আলোর ব্যবস্থা নেই। বহু দূরে দূরে বসানো লাইটপোস্টগুলোর নিষ্প্রভ আলোয় অন্ধকার যেন আরো থমথমে করে তোলে।

শহরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ঠিক যেন একটা ভুলে যাওয়া পরিত্যক্ত প্রাচীন পুরীর ভেতর দিয়ে যাচ্ছি মনে হল।

যাবার পথে মতিকোঠির রাস্তা দিয়েও গেল গাড়িটা।

সে রাস্তাও সমান নির্জন। ড্রাইভারকে একটু আস্তে চালাতে বলে গাড়ি থেকে টর্চের আলো ফেলে জোয়ালাপ্রসাদ বাড়ির বাইরের দরজাটাও দেখালে। সাবেকী ধরনের পেতলের ডুমো বসানো দরজা দুটো বন্ধ। তার প্রকাণ্ড কড়ায় বড় বড় দুটো তালা ঝুলছে।

এরপর শহর পার হয়ে যেতে খুব বেশী সময় লাগল না। এ প্রান্ত থেকে শহরের অপর প্রান্তে তখন প্রায় এসে পড়েছি। আর একটু এগোলেই এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যাবার আন্ত-প্রাদেশিক বড় সড়ক।

হঠাৎ সেখানেই হুমড়ি খেয়ে সামনে প্রায় উল্টে পড়তে হল।

বিশ্রী কর্কশ শব্দ করে প্রাণপণে ব্রেক কষে রংগুলাল গাড়িটা থামিয়েছে। গাড়ির ওপর এসে পড়া তীব্র চোখ ধাঁধানো আলোয় তখন আমরা প্রায় অন্ধ।

এরপর ঠিক যেন বিলিতি ছায়াছবির ব্যাপার ঘটল। নেহাৎ নিজেদের প্রাণ নিয়ে তখন টানাটানি নইলে আমাদের জোয়ালাপ্রসাদের বাতিল করা গোয়েন্দা গল্পের একটা দৃশ্য বলতে পারতাম।

চোখটা একটু সয়ে যাবার পর দেখলাম দু-দুটো গাড়ি আমাদের

সামনে কিছুদূরে দাঁড় করানো। তাদেরই অতি প্রখর হেডলাইট আমাদের ওপর ফেলা হয়েছে। দেখতে দেখতে দুটি গাড়ি থেকেই কালো টি শার্ট ও প্যাণ্ট পরা আর কালো মুখোশ ঢাকা দুজন করে লোক বেরিয়ে আমাদের গাড়ির দু'পাশে এসে দাঁড়াল। তারপর তাদের একজনের কড়া গলার হুকুম শুনলাম,—গাড়ি নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল।

আমি তখন সত্যি হতভম্ব। পরাশরের মুখেও কোন কথা নেই। প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝেই বোধহয় ড্রাইভার রঙ্গুলালও চুপ।

রুখে দাঁড়াল শুধু জোয়ালাপ্রসাদই নিজে।

কেন! তোমাদের সঙ্গে যাব কেন? কে তোমরা?

জবাবে মুখোশধারীদের সর্দার শুধু তার পিস্তলটা জোয়ালার মাথার কাছে একটু চেপে ধরল। আমিই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললাম, চুপ কর জোয়ালা। মিছে আপত্তি করে লাভ নেই।

কিন্তু......বলে জোয়ালা কি বলতে গেল। তাকে প্রায় ধমক দিয়ে থামিয়ে বললাম, চুপ কর! গুলি ভরা পিস্তলের সঙ্গে ন্যায় অন্যায়ের তর্ক চলে না।

জোয়ালাপ্রসাদ আমার দিকেই একবার নিষ্ফল প্রতিবাদের জ্বলন্ত দৃষ্টিটা হেনে চুপ করে গেল।

সামনে ও পিছনে মুখোশধারীদের দু'গাড়ির পাহারায় আমাদের গাড়িকে রওনা হতে হল। গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ফিরে যেতে হল কিন্তু শহরের দিকেই।

যেখানে গিয়ে আমাদের থামাল অন্ধকারেও সেটা অন্য একটা পাড়া বলে বুঝলাম। চওড়া রাস্তা, কিন্তু কাছাকাছি অনেকগুলো ছোট বড় ইমারত রাস্তার এদিকে ওদিকে দেখে জায়গাটা খুব নির্জন বলেও মনে হল না।

গাড়ি থেকে নামিয়ে রাস্তা থেকেই খাড়া হয়ে ওঠা প্রকাণ্ড যে তিনতলা বাড়ির মজবুত বিশাল দরজা খুলে আমাদের ভেতরে ঢোকানো হল সেটি কিন্তু প্রায় একটা দুর্গের সামিল।

দরজা দিয়ে ঢোকবার পর একটা লম্বা করিডর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে সামনে একটা চওড়া সিঁড়ির নিচের ক'টা ধাপ দেখতে পেলাম। করিডরের পর সামান্য একটু আলোতেই জায়গাটা বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে।

করিডর পার হয়ে আরো কাছে যেতে সিঁড়িটা পুরোপুরিই স্পষ্ট হল। দু'ধারে পাথরের কারুকাজ করা রেলিং দেওয়া ছোট ছোট ধাপের চওড়া সিঁড়িটা কিছুদূর উঠে একটা ল্যান্ডিং-এ দু'ভাগ হয়ে দুমহলে যেন চলে গেছে।

এই সিঁড়ি দিয়েই আমাদের ওপরে যেতে হবে। কিন্তু সিঁড়ির নিচেই আমি তখন দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমার সঙ্গে জোয়ালাপ্রসাদ আর পরাশরও।

সঙ্গের মুখোশধারী পাহারাদারদের একজন পিস্তল দিয়েই একটা খোঁচা দিয়ে কর্কশ গলায় বললে, দাঁড়ালে কেন? ওঠ জলদি।

তাই উঠলাম। কিন্তু যেজন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম সিঁড়ির ওপরের ল্যান্ডিংএ পোঁছে সেইজন্যেই আবার থামতে হল।

সেখানে দেওয়ানীই স্বয়ং অদ্ভুত একটা রাগের জ্বালা আর কৌতুক মেশানো মুখের ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে পণ্ডিতজী। তাঁর মুখ কিন্তু হিংস্র কঠিন।

নিজে থেকে না চাইলেও এখানে আমায় থামতে হত। কারণ দেওয়ানীই নিজে ডেকে আমায় থামালে, বিশেষ করে আমাকেই।

আবার তাহলে আমার কাছে আসতে হল! আমি জানতাম তা হবেই!

জানতে! বিদ্রুপের তীক্ষ্ণতাটা এতটুকু মোলায়েম করবার চেষ্টা না করে বললাম, এমন করে জুলুম করে বন্দী করে আনবে তাও জানতে তাহলে?

যদি বলি তাও জানতামই—দেওয়ানী আমার দিকে চেয়ে মুচকে হাসল।

আরো কিছু যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পড়ল প্রথম পণ্ডিতজীর কাছ থেকেই। দেওয়ানীর কথা শেষ হতে না হতেই তিনি প্রায় বজ্রস্বরে গর্জন করে উঠলেন, না, কিছুই জানতাম না আমরা! জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পণ্ডিতজী আমাদের শুধু নয়, মুখোশধারী প্রহরীদের দিকেও তাকিয়ে বললেন, আমাদের আজই রাত্রে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। এই রকম সব মুখোশ ঢাকা গুণ্ডারাই আমাদের এনেছে, দরকারী একটা জিনিসও সঙ্গে আনতে দেয়নি।

তাতে আপনাদের খুব অসুবিধা হয়েছে কি? আমাকে হতভম্ব করে পরাশরই জবাব দিলে, নিজেদের বাড়ির চেয়ে কিছু কম আরামে

এখানে আপনাদের রাখার ব্যবস্থা বোধহয় হয়নি। আর—একটু থেমে দেওয়ানীর দিকে চেয়ে তাকেই সমর্থন জানিয়ে পরাশর প্রায় যেন ভক্তি ভরে আবার বললে—আপনি জানতেন না বলে আমাদের দেবীজীর কাছেও এ ব্যাপারটা অজানা ছিল ভাবছেন কেন? উনি আগে থেকে সবই নিশ্চয় জানতেন।

পরাশরের এ আবার কি ভণ্ডামি? নাকি সত্যি তার অকালে ভীমরতি ধরেছে? পরাশরের কথায় দেওয়ানীর মুখের চাপা হাসিটুকু দেখে আরো যেন গা-টা জ্বলে গেল।

প্রায় পণ্ডিতজীর মত গলাতেই বললাম, সব বুজরুকি! ডাঁহা বুজরুকি! আগে থাকতে উনি কিছুই জানতে পারেননি। আর তা যদি পেরে থাকেন তাহলে বলব মনোহরলালের সঙ্গে আমাদের যে আজ বন্দী করিয়েছে সেই কাপুরের সঙ্গে ওই ত্রিকালজ্ঞ সাজা দেবীর গোপন সড় আছে......

খামোশ!

যেটুকু বলেছি তার বেশী আর কিছু বলা গেল না। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ দাঁড়িয়ে আলাপ যারা বরদাস্ত করছিল তারা এক মুহূর্তে হিংস্র হয়ে উঠল। খামোশ—বলে চোখ রাঙিয়ে আমায় থামিয়ে তারা পিস্তল তুলেই অন্যদিকের সিঁড়িটা দেখিয়ে দিলে।

অর্থাৎ নিজেদের ভাল চাইলে সেই সিঁড়ি দিয়েই এখন উঠে যেতে হবে। প্রতিবাদ নিষ্ফল, তাই সেই হুকুম অমান্য করলাম না। মনের ভেতর গর্জালেও মুখোশধারীদের পাহারায় নীরবেই নিজেদের জন্যে বরাদ্দ দোতলার মহলে গিয়ে উঠলাম।

পরাশর পণ্ডিতজীকে খানিক আগে যা বলেছিল সে কথাটা অবশ্য আমাদের মহল সম্বন্ধেও সত্য। এ মহলের ঘর-দোর সাজ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে খুঁত ধরবার কিছু নেই। প্রায় বাদশাহী আয়েশে রাখবার ব্যবস্থা। বন্দীত্বের খাঁচাটা সোনার বানিয়ে যেন আমাদের আরো নিষ্ঠুর বিদ্রূপে বিঁধে মারা।

আমাদের ওপরের মহলে ঢুকিয়ে দিয়ে, মুখোশধারীরা দুটো হুমকি দিয়ে গেল।—এ বাড়িতে আমরা যেমন খুশি যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়াতে পারি, কিন্তু এ বাড়ি থেকে কখনো যেন পালাবার চেষ্টা না করি, আর এখানকার কোন জিনিস যেন না নাড়ি।

না নাড়ি, মানে! প্রথম নিষেধটার অর্থ বুঝলেও দ্বিতীয়টা একেবারেই না বুঝে আমায় জিজ্ঞাসা করতেই হল, এখানে থাকব অথচ জিনিস-পত্র নাড়ব না? কোন কিছু না ছুঁয়ে থাকতে হবে নাকি?

না না, তা হবে কেন? পরাশর মুখোশধারীদের হয়েই আমায় বোঝাতে ব্যস্ত হল। চেয়ার টেবিল দেরাজ আলমারি কি সাধারণ দরকারী জিনিস নয়, দামি কিছু নাড়তে চাড়তে বারণ করছে ওরা।

ঠিক! ঠিক! পরাশরের ওপর খুশি হয়েই সায় দিল মুখোশধারীদের একজন।

আমি কিন্তু সুবোধ ছেলের মত কথাটা ওই ভাবেই মেনে নিয়ে চুপ করে থাকতে পারলাম না। পরাশরের মুখোশধারীদের হয়ে ওকালতিতেই মেজাজটা বেশী গরম হয়ে গিয়েছিল।

সেই মেজাজেই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, দামী জিনিস তো নাড়ব না, কিন্তু এই সব শোবার বসবার আর সাধারণ জিনিস ছাড়া এ মহলে আর আছে কি? হীরে জহরত লুকোনো আছে নাকি?

আহা থাকতেও তো পারে—পরাশর আবার শত্রুপক্ষের হয়েই আমায় বোঝালে, সে সব কিছু চোখে পড়লেও ছোঁবে না। মোদ্দা কথা হল এই।

মুখোশধারীদের হয়ে পরাশরের এত ওকালতির কারণ বোঝা গেল এর পরেই।

আমাকে যেমন করে হোক থামিয়ে সে আবার মুখোশধারীদের দিকেই ফিরে গলায় যেন মধু ঢেলে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা পালাবার চেষ্টা যদি না করি, তাহলে একটু খেলাধুলোয় তো মানা নেই?

মুখ দেখা যায় না, তবু মুখোশের মধ্যে চোখের ফাঁকগুলোতেই যেন একটা সন্দেহের ঝিলিক ফুটে উঠতে দেখলাম।

জোয়ালাপ্রসাদের চোখ দুটো পর্যন্ত কুঁচকে গেছে। পরাশরের এ অদ্ভুত আবদারের মানে না বুঝতে পেরেই বোধহয়। মানেটা আমিও অবশ্য তখন আঁচ করতে পারিনি। তাই এরপর পরাশরের ব্যাখ্যায় আর সকলের মতই যেমন হতভম্ব হলাম, কৌতুকবোধও করলাম তেমনি।

জোয়ালা তো এত বিপদের মাঝেও হেসে ফেলে বললে, আপনি এখন ঘুড়ি ওড়াবার কথা ভাবতে পারলেন ভর্মাজী?

না, মানে—পরাশরকে একটু লজ্জিতই মনে হল এবার।—ঘুড়িগুলো

সঙ্গে রয়েছে, এখানে আর কিছু করবারও নেই, তাই ভাবছিলাম তেতলার ছাদে যদি একটু আধটু ওড়াই......

পরাশরকে অবশ্য খুব বেশী সাধাসাধি আর করতে হল না। মুখোশের আড়ালে মুখোশধারীরাও মুচকে হাসল কিনা জানি না কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াবার মত ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াবার অনুমতি তারা দিয়ে গেল।

আমাদের অদ্ভুত বন্দীজীবন শুরু হল এরপর থেকে। একদিক দিয়ে কোন অভাবই নেই। একেবারে রাজার হালে রাখা যাকে বলে। যেমন ঘর-দোর-বিছানা তেমনি চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দু'বেলা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা।

কিন্তু দু'দিন বাদে এ খাওয়া আর গলা দিয়ে নামতে চায় না। মখমলের বিছানা তখন কণ্টক শয্যা আর যা মুখে দিই তাই বিষ।

কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই পরাশরের। তেতলার ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে পেয়েই সে খুশি। আর কিছু করবার নেই বলে একদিন জোয়ালার সঙ্গে পরাশরের ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে ছাদেও গিয়েছিলাম। গিয়েই বুঝেছিলাম মুখোশধারীরা ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে দিতে কেন আপত্তি করেনি।

ছাদের চারিদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সাধারণ দেয়াল নয়, অন্তত দু' মানুষ সমান উঁচু আর ভেতরের দিক থেকে একেবারে মসৃণ।

এমনিতে তো ওপরের চৌকো আকাশটুকু ছাড়া বাইরের কিছু দেখা যায় না। দেয়াল বেয়ে উঠে উঁকি দেবারও উপায় নেই।

তবু এই এক ফালি আকাশে ঘুড়ি উড়িয়েই পরাশর সন্তুষ্ট। এমন ভাবে বন্দী হয়ে থাকা নিয়ে তার যেন কোন অভিযোগই নেই।

আমাদের কিন্তু ক'দিনেই একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল।

বন্দী করে রাখবার দিন চারেক বাদে নামমাত্র খাওয়া দাওয়ার পর পরাশরকে নির্বিকারভাবে তার ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ছাদে যাবার উদ্যোগ করতে দেখে রাগটা গিয়ে পড়ল তারই ওপরে।

তোমার এখনো ঘুড়ি ওড়াতে ইচ্ছে করে? বেশ ঝাঁঝালো গলাতেই বললাম, কোথায় কি ভাবে আছি তা নিয়ে একটু ভাবনাও হয় না?

পরাশর একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, ভাবনা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করছ! কিন্তু ভাবনার সত্যি কিছু আছে কি?

ভাবনার নেই! আমার গলাটা তীক্ষ্ন হয়ে উঠল রাগে ও বিস্ময়ে!

এই অবস্থায় নির্বিকার সেজে আমাদের সঙ্গে রসিকতা করতে চায় পরাশর?

আমি এরপর কি বলতাম জানি না। কিন্তু জোয়ালাপ্রসাদ আমার আগেই হতাশ করুণ মুখ করে বললে, বলছেন কি বর্মাজী! আর ভাববারও কিছু নেই! তার মানে আমাদের এখানে এমনি কয়েদ হয়েই থাকতে হবে?

আহা তা থাকবেন কেন? পরাশর জোয়ালার করুণ অবস্থা দেখে যেন স্তোক দেবার জন্যেই একটি ধাঁধা ছাড়ল মনে হল, বললে, বিলেত থেকে খবর এলে তুমি তো আগেই ছাড়া পাবে।

আমি আগে ছাড়া পাব? আর বিলেত থেকে খবর এলে? জোয়ালা-প্রসাদের মুখটা ঠাট্টা সন্দেহ করেই তখন লাল হয়ে উঠেছে। নিজেকে তবু সামলে বললে, এ সময়ে হাসি তামাশা করবেন না বর্মাজী!

হাসি তামাশা করছি না জোয়ালা। পরাশর নিজের অন্যায়টা ঢাকবার জন্যেই গম্ভীর হয়ে উঠল সম্ভবত, শৌখিন সবরকম শিল্পের সবচেয়ে বড় বাজার এখনো লন্ডন তা জানো তো! সবচেয়ে নামী খানদানী সাচ্চা ব্যাপারী সেখানে যেমন আছে তেমনি আছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আর ওঁচা চোরাবাজার। চোরাই জিনিসের সবচেয়ে চড়া দাম পেতে গেলে সেখানেই যেতে হয়।

তার মানে,--পরাশরের কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা এতক্ষণে ধরতে পেরে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, রামস্বরূপজীর কারবারের সব চুরি করা মাল ওই লন্ডনেই পাচার হয়ে গেছে ভাবছ? রতনচাঁদ সেখানে মাল পৌঁছবার খবরের জন্যেই অপেক্ষা করে আছে? পাকা খবর পেয়ে গেলে আমাদের আর ধরে রাখবে না বলছ?

হ্যাঁ, আমরা ছাড়াই পেয়ে যাব বোধহয়, আমাদের ধরে রাখবার আর দরকার নেই বলে! পরাশর আমার ধারণা একটু সংশোধন করলে, তবে পাকা খবরটা মাল পৌঁছবার নয়। মালের পরিচয় দিয়ে দরাদরি আর বেচা কেনার বায়নার। বিলেতের চোরাবাজারের সঙ্গে এ কারবার তো এই প্রথম হচ্ছে না, বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। চোরা ব্যাপারীদের সঙ্গে তাই জান-পয়ছান হয়ে গেছে। তাদের মুখের কথা পেলেই মাল পাঠাবার ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু,—আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বিলেতের চোরাই লেনদেনের খবরের জন্যে আমাদের ধরে রাখা কেন? জোয়ালার সঙ্গে

আমরা তো এই অজ মফঃস্বল শহরে পড়ে আছি। কোথায় মাল কোথায় বিলেতের চোরাকারবারী কিছুই না জেনে আমরা কি এ লেনদেনে বাগড়া দিতে পারি?

পারি না পারি সাবধানের বিনাশ নেই। পরাশর জোয়ালার কাছেই সমর্থন চাইলে, কি বল জোয়ালা?

জোয়ালা কিন্তু তখন বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। পরাশরের দিকে ফিরে বেশ একটু উদ্বেগের সঙ্গেই বললে, আমি কিন্তু আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না বর্মাজী। আপনি তো এ ব্যাপারের অনেক কথা জানেন দেখছি। যা বললেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো ব্যাপারটা বেশ গুরুতর।

গুরুতর নয় তো কি আমাদের এভাবে বন্দী করে রাখাটা হাল্কা ঠাট্টা ভাবছিলে তুমি! পরাশর জোয়ালাকেই একটু খোঁচা দিয়ে বললে, আমাদের শেষ পর্যন্ত ছাড়া পাওয়া নিয়ে তাই আমার মনে একটু সন্দেহ আছে।

কি উল্টো-পাল্টা বকছ! পরাশরকে একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বললাম, এই তো খানিক আগে বললে যে বিলেত থেকে পাকা খবর এলেই জোয়ালাকে আগে ছেড়ে দেবে। জোয়ালা ছাড়া পেলে আমরা পাব না?

পেলেই ভাল! বলে পরাশর প্রসঙ্গটা যেন এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু আমি ছাড়লাম না। বললাম, সে বিষয়ে মনে কোন রকম সন্দেহ যদি থাকে তো হাল ছেড়ে দিয়ে শুধু ঘুড়ি ওড়ালে তো চলবে না। এ কয়েদখানা থেকে বার হবার প্রাণপণ চেষ্টা তো করতে হবে।

প্রাণ তো অনায়াসেই পণ করা যায়। পরাশর যেন আমায় একটু বিদ্রূপ করে বললে, কিন্তু তাতে পালাবার উপায় বার হয় কি? কি করতে চাও কি?

কি করতে চাই? পরাশরের দিকে চেয়ে কদিন ধরে যে কথাটা ভেবেছি তাই জানালাম। বললাম, আমাদের এ কয়েদখানাটার পাহারা যত কড়াই হোক, বাড়িটা যে শহরের মাঝখানে এটা অন্তত সেদিন রাত্রেই জেনেছি। আমাদের বাইরের কারুর সঙ্গে যেভাবে হোক যোগাযোগ করা তাই অসম্ভব নয়।

সম্ভবটা কি করে তাই জিজ্ঞাসা করছি। পরাশর এবার একটু আগ্রহই দেখাল আলোচনাটায়—আমাদের মহলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের

সব ব্যবস্থাই আছে, কিন্তু সব কটা জানালাই যে জম্পেশ করে আঁটা তা লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়। ভেতর থেকে একটা মাছিরও গলে বার হবার রাস্তা নেই।

মাছির চেয়ে মানুষের বুদ্ধির ক্ষমতা অনেক বেশী। আমি হার মানলাম না, কবরের মত পাতাল কুঠরির কয়েদখানা থেকেও কত বন্দী মাসের পর মাস ধরে গোপনে সুড়ঙ্গ কেটে পালাবার উপায় করেছে। আমরা এই কাঠের পাল্লা আর তারের জালে আঁটা জানলাগুলোয় ক'টা ফুটো করতে পারব না?

শুধু তারের জাল নয়, ওদিকে লোহার পাতও আঁটা আছে। বললে জোয়ালা।

তা থাক। আমি দমলাম না, লোহার পাতও ফুটো করা যায়। আর সামান্য ক'টা ফুটো করতে পারলেই কি ভাবে কাজ হাসিল করব তাও ঠিক করা আছে।

কিভাবে? জোয়ালা উৎসুক হয়ে উঠল এবার।

এখানে বন্দী করবার সময় আমাদের সঙ্গের জিনিসপত্রে ওরা হাত দেয়নি। আমি আমার ফন্দিটা বুঝিয়ে দিলাম, জোয়ালার টর্চটা ওর টেবিলেই আছে দেখেছি। সেই টর্চের আলো জানালার ফুটোগুলো দিয়ে রাত্রিবেলা বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফেললে কারুর না কারুর তা চোখে পড়তে পারে। বিশেষ করে অন্ধকারে একটা বন্ধ বাড়ির দেখলে কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক। টর্চের জ্বলা-নেভাটা টেলিগ্রাফের মত মর্স কোডেও করে দেখা যায়।

কিন্তু—জোয়ালা রীতিমত উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, মর্স কোড তো তার জন্যে জানা চাই।

আমি জানি। গর্বভরেই এবার জানালাম, অন্তত টরে টরে টরে,—টরে টক্কা,—টরে টরে টরে টক্কা,—টরে। দিয়ে সেভ্ মানে বাঁচাও কথাটা জানাবার সঙ্কেতগুলো মুখস্থ আছে। ছেলেবেলা মজা করবার জন্যে শিখেছিলাম।

তাহলে তো আর ভাবনাই নেই। পরাশরও সমর্থন জানাল, এখন শুধু জানালায় আমাদের পাহারাদারদের অজান্তে ক'টা ফুটো করা নিয়ে কথা।

কিন্তু সেই ফুটো করাই দেখা গেল আমাদের সাধ্যের বাইরে।

জানালার ওধারের লোহার পাত ফুটো করা দূরে থাক এদিকের তারের জাল কেটে কাঠের পাল্লা ছ্যাঁদা করার মত কোন কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না। সম্বলের মধ্যে আমারই পকেটের একটা প্রায়-ভোঁতা পেন্সিল কাটা ছুরি। অফিসের টেবিল থেকে আসবার সময় তাড়াহুড়ার সঙ্গে চলে এসেছে।

কোন সুবিধামত যন্ত্র পেয়ে জানালায় ফুটো করতে পারলেও লাভ যে কিছু হত না তা জানতে পারলাম সন্ধ্যের দিকে। ভোঁতা ছুরি দিয়ে তার কাটবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে জোয়ালাকে তার টর্চটা একটু আনতে বলেছিলাম। সে এসে যা খবর দিলে তাতে একেবারে বসে পড়লাম। জোয়ালা টর্চ আনবার সময় একটু জ্বালতে গিয়ে দেখে টর্চ একেবারে অচল। তার মধ্যে কোন ব্যাটারিই নেই। টর্চটা তার টেবিলে সাজিয়ে রেখে কখন যে তার ব্যাটারিগুলো খুলে বার করে নেওয়া হয়েছে তা বুঝতেই পারা যায়নি।

আমাদের পরিচর্যার জন্যে অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ চেহারার যে বয়স্কা বাইটি এসে রোজ দু'বেলা ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করে যায় এ কাজ তার ছাড়া আর কারুর হতে পারে না। ব্যাপারটা সেই জন্যেই অত সাংঘাতিক মনে হল।

আমাদের সম্বন্ধে মুখোশধারীদের মনোভাব যে বদলাচ্ছে তার আরো একটা বড় প্রমাণ সেইদিন সন্ধ্যের পরই পাওয়া গেল। টর্চের ব্যাটারি সরিয়ে নেওয়ায় মনের অবস্থাটা অমন বিশ্রী না হলে ব্যাপারটায় মজাই পেতাম হয়তো।

আমাদের জানালা ফুটোয় সাহায্য করবার জন্যে পরাশর সেদিন ওপরের ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে যেতে পারেনি। লাটাই ঘুড়ির সরঞ্জাম-গুলো যথাস্থানেই রাখা ছিল। জোয়ালাপ্রসাদের পর চোটটা হঠাৎ তার ওপরেই আসবে কে জানত!

বন্দী করে রাখলেও এ কয়দিনের মধ্যে মুখোশধারী পাহারাদারেরা আমাদের বিরক্ত করেনি বললেই হয়। কালে-ভদ্রে এক আধবার দেখা দিয়েছে মাত্র।

সেদিন হঠাৎ অসময়ে সন্ধ্যের পর সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনেই প্রথমটা চমকে গিয়েছিলাম। খানিক বাদে মুখোশধারীদের একজনকে ঢুকতে দেখে বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ করতে হল। অস্বস্তি শুধু অসময়ে আসার জন্যে নয়, লোকটার চলাফেরার ধরণেও। একটা

কিছু মতলব নিয়েই সে যে এসেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথমটা আমাদের বসবার ঘরটায় এসে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে তার মুখ ঘুরিয়ে দেখাটা কেমন যেন অনিশ্চিত।

জোয়ালাপ্রসাদই প্রথম সাহস করে একটু জোর গলায় তাকে বললে, ওদিকে অমন করে দেখছ কি? ওসব তো বর্মাজীর ঘুড়ি লাটাই।

জোয়ালাপ্রসাদের ঘুড়ি লাটাই-এর নামটা উচ্চারণ করাই যেন কাল হল।

আমাদের দিক থেকে এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে লোকটা সোজা ঘুড়ি লাটাইগুলো বগলদাবা করে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেল।

তার কাণ্ড দেখে আমরা তো থ। জোয়ালাপ্রসাদ হাঁ হাঁ করে উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু লোকটা তাতে ভ্রূক্ষেপও করেনি।

এবার তো অন্যায় জুলুম শুরু হয়ে গেল দেখছি। লোকটা চলে যাবার পর জোয়ালা বললে, আপনার ঘুড়ি ওড়ানোর সুখটুকুও ওদের সহ্য হল না!

এ সুখ অবশ্য বেশীদিন আর ভোগ করা হত না। পরাশর দুর্ভাগ্যটা দার্শনিক বৈরাগ্যেই যেন মেনে নিয়ে বললে, ওড়াবার ঘুড়ি আর বেশী ছিল না।

সে কি! আমিই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কম করে এক কুড়ি ঘুড়ি তো সঙ্গে এনেছিলে মনে হয়।

তা এনেছিলাম। পরাশরের হাসিটা করুণই মনে হল, কিন্তু ঘুড়ি তো আর অজর অমর জিনিস নয়। ওড়াতে গেলেই কাটে ছেঁড়ে হারায়।

আচ্ছা, জোয়ালা চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ আপনার ঘুড়িগুলোর ওপর খাপ্পা হবার কারণ কিছু বুঝতে পারছেন?

কারণ, আমাদের ওপর সন্দেহ ওদের ক্রমশ বাড়ছে। বললে পরাশর, বিলেত থেকে খারাপ খবর এলে আরো খাপ্পা হবে।

বিলেত থেকে খারাপ খবরও তাহলে আসতে পারে! আমি একটু অবিশ্বাসের সুরেই জিজ্ঞাসা করলাম।

তা পারে বই কি। বলে পরাশর আবার একটি ধাঁধা ছাড়ল, বিশেষ করে দুশো পঁয়ষট্টি নম্বর যদি বাদ সাধে।

দুশো পঁয়ষট্টি নম্বর! একসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করলাম আমি আর জোয়ালা।

ওটা একটা ঘরের নম্বর, পরাশরের মুখের হাসিটা খুব সরল মনে হল না, চোরা কারবারের সব চাল ওই দুশো পঁয়ষট্টিই ভেস্তে দিতে পারে।

দুশো পঁয়ষট্টি কি লণ্ডন পুলিশের কোন অফিস ঘরের নম্বর? জোয়ালা প্রায় যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

হ্যাঁ, জানালে পরাশর, নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নতুন বাড়ির ওটি একটি বিখ্যাত ঘর। সারা দুনিয়ায় ইনটারপোল-এর একশো সতেরোটি সদস্য দেশ দামী শিল্প সামগ্রী সংক্রান্ত সমস্যার কিনারা করতে ওই নম্বরের ঘরটিরই শরণ নেয়।

তুমি এ ব্যাপারে এত সব জানলে কি করে? জোয়ালার মুখের ভাব দেখে মনে হল তার প্রশ্নটাই যেন আমার মুখ দিয়ে বার হল।

শখ করে কি আর জেনেছি। পরাশর আমার প্রশ্নে আবার একটু ঠোঁট টিপে হাসল, রামস্বরূপজী আর জোয়ালার কাছে বারবার দামী দামী সব জিনিস চুরির কথা শুনে একটু কষ্ট করে খোঁজ খবর নিয়ে সব জানতে হয়েছে।

কিন্তু এত জানাশোনা সবই বোধহয় বৃথা হল। গম্ভীর হয়ে জোয়ালা ভারী গলায় বললে, ওই দুশো পঁয়ষট্টি নম্বর বাদ সাধার দরুন বিলেত থেকে খারাপ খবর যদি কিছু আসে তাহলে কি হবে তা বুঝতে পারছেন?

তা পারছি বইকি—পরাশর যেন চিন্তিত মুখেই বললে, এ কয়েদ-খানা থেকে ছাড়া পাবার আশা আর আমাদের থাকবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু সে-রাত্রেই সে আশা অমন অবিশ্বাস্যভাবে দেখা দেবে কল্পনাও করিনি। ওপরের মহলে আমরা তিনজনে পরপর তিনটি আলাদা ঘরে শুই। নিচের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবার পর প্রথম ঘরটা আমার, তার পরেরটায় থাকে জোয়ালা আর একেবারে শেষটায় পরাশর।

এক ঘর থেকে আরেক ঘরে করিডর দিয়েই যাতায়াত করার ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের তার দরকার হয় না। নিজেরাই বন্দী, আমাদের আর

সাবধান হবার কি আছে! ঘরের সব দরজা তাই খোলাই থাকে সারাক্ষণ।

বেশ অনেক রাত পর্যন্ত দুর্ভাবনায় জেগে থাকবার পর সবে তখন বোধহয় ঘুমটা এসেছে। হঠাৎ কি রকম একটা অদ্ভুত আবেশের আচ্ছন্নতা সমস্ত শরীর মনে যেন অনুভব করলাম। সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে নরম পালকের মত কিসের যেন একটা মধুর হালকা স্পর্শ কে বুলিয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্ন দেখছি কি? কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে কি গন্ধের কোন অনুভূতি থাকে?

আমি কিন্তু তখন একটা অজানা অপরূপ সুরভির মাদকতা বেশ ভাল ভাবেই টের পেতে শুরু করেছি। ঘুমটা আরেকটু পাতলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরে একটা কি রকম মৃদু অস্পষ্ট শব্দও পেয়ে প্রথমটা জোয়ালাই কোন কিছু দরকারে এ ঘরে এসেছে. ভাবলাম।

জোয়ালা সব সময়েই সুগন্ধ কিছু ব্যবহার করে শোবার বিছানাতেও। কিন্তু এ তো তার ব্যবহার করা সেন্টের গন্ধ নয়! তাহলে?

ধড়মড় করে এবার বিছানায় উঠে বসতে যাচ্ছিলাম কিন্তু পারলাম না। সুগন্ধটা আরো ঘনিষ্ঠ হবার সঙ্গে মুখের ওপর একটা হাত চাপা পড়ল, অতি কোমল মসৃণ একটা হাত। সেই সঙ্গে প্রায় নিঃশব্দে উচ্চারিত ক'টি কথা—কথা বোলো না। চুপি চুপি এসো।

কিছুই বুঝতে পারিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু যা বুঝলাম তাই অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কি করব এখন? আলো জেবলে ফেলে জোয়ালা আর পরাশরকে ডেকে তুলব?

এই দ্বিধা সংশয়ের মধ্যেই কানের কাছে স্বপ্নমদির একটা স্পর্শ অনুভব করলাম আর সেই সঙ্গে সেই অস্ফুট অথচ তীব্র মিনতি, দেরী কোরো না। এসো।

একটা স্পষ্ট সুগন্ধ। অস্ফুট গলার আর অস্ফুট পদশব্দের পিছু পিছু অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমেই গেলাম এবার। রহস্যটা কি তা দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত।

দোতলায় ল্যান্ডিং-এ গিয়ে একটু দাঁড়াতে হল। অস্পষ্ট ছায়া সেখানকার গাঢ় অন্ধকারে একেবারে অদৃশ্য কিন্তু শারীরিক

উপস্থিতিটা আমার গায়ের সঙ্গে প্রায় লেগে থাকা উষ্ণ কোমল স্পর্শে অত্যন্ত বেশী স্পষ্ট।

ফিস ফিস করে হলেও কানের কাছে মুখ তুলে বলা কথাটাও তাই।

কি জন্যে তোমাকে ডেকে এনেছি, জানো?

গলাটা না তুললেও বেশ একটু কঠিন রেখেই বললাম, না।

চল নিচে গিয়ে বলব। সাবধানে এসো।

তাও গেলাম। কৌতূহল তখন বিচার বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে গেছে। কি জন্যে আমায় মাঝরাত্রে এমন করে ডেকে এনেছে এই রহস্যময়ী? নিচে নিয়ে যাচ্ছে কেন? কি বলতে চায় সেখানে? কি বলতে চায় তা জানবার আগে নিচে গিয়ে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে একেবারে অবাক।

নিজের মহল ছাড়া দোতলা বা নিচের তলার কিছু দেখবার সুবিধে এ পর্যন্ত হয়নি। সন্তর্পণে নিচে নেমে যাওয়ার পর আমার ছায়াময়ী সঙ্গিনী যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে একটি দরজার তালা খুলে আমাদের ওপর মহলেরই ছকে ফেলা একটি করিডর দিয়ে একটি বিরাট ঘরের মধ্যে এনে দাঁড় করাবার পর চোখ দুটো হঠাৎ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল।

এতক্ষণের অন্ধকারের পর শুধু আকস্মিক আলোর উজ্জ্বলতায় নয়, চোখে একটু সয়ে যাওয়ার পর ঘরে যা দেখলাম তাতেও।

সাধারণ ঘর নয়, যেন নাম-করা কোন যাদুঘরের বিরল সংগ্রহশালা। গালচে পর্দা কার্পেট, হাতীর দাঁত ব্রোঞ্জ পাথরের মূর্তি, পুরোনো ছবি ইত্যাদি মিলে যে ক'টা বাছাই করা জিনিস সেখানে আছে আমার আনাড়ি চোখেও তাদের মহামূল্য ধরা পড়তে দেরী হল না।

এই তাহলে রতনচাঁদের চোরাই কারবারের ঘাঁটি? কলকাতা থেকে এই সুদূর অজ মফঃস্বল শহরে এ সব জিনিস লুকিয়ে রেখে সে সুবিধামত বিদেশে পাচারের ব্যবস্থা করে?

উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠে মুখে একটু হাসি নিয়ে আমার পাশে যে দাঁড়িয়ে আছে জাতিস্মরা বলে দাবী করা সেই দেওয়ানীই কি তাহলে তার সহায় সঙ্গিনী? তাহলে আমায় এমন করে ডেকে এনে এ সব দেখানো কেন? সেই কথাই জানতে চাইলাম এবার।

কেন এখানে এনেছি তা এখনো বুঝতে পারছ না? দেওয়ানী আমার দিকে চেয়ে যেন হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললে, এনেছি আমরা কেন

এখানে বন্দী চাক্ষুষ তা দেখাবার জন্যে। এ সব জিনিস এখানে থাকতে তো নয়ই, এখান থেকে পাচার হবার পরও আমরা কোন দিন ছাড়া পাব কি না সন্দেহ। তাই বলতে চাই...

ওই পর্যন্ত বলেই হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দেয়ালের সুইচটা টিপে দেওয়ানী ঘরটা অন্ধকার করে দিলে। তারপর একেবারে কাছে ঘেঁসে এসে চাপা স্বরে বললে—সাহস থাকে তো চল পলাই।

পালাব! দেওয়ানীর কথায় রীতিমত চমকে উঠলেও গলার স্বরটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করে বললাম, পালাতে চাইলেই পালানো যায় নাকি! মুখোশধারীরা কি মিছিমিছি পাহারা দিচ্ছে?

যতই পাহারা দিক—দেওয়ানী চাপা গলাতেও বেশ জোরের সঙ্গে জানালে, আমাদের ধরতে পারবে না। পালাবার এমন পথ আমি জানি যা ওদের কল্পনার বাইরে। বল, সাহস আছে আমায় নিয়ে পালাবার?

তোমায় নিয়ে?—মুখে ওইটুকু বলে মনের মধ্যে অনেক কিছু তাড়াতাড়ি ভেবে নিলাম। সাময়িক মোহে বা যে কারণেই হোক যে সুযোগ দেওয়ানী আমায় দিচ্ছে তা ছাড়া কি উচিত? সত্যিই এ রকম কোন পালাবার উপায় যদি তার জানা থাকে তাহলে সেটা আমাদের সকলের জন্যেই তো কাজে লাগাতে পারি। শুধু একা আমি নয়, পরাশর আর জোয়ালাও তো আমার সঙ্গে পালাতে পারে।

আমার একটু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকায় দেওয়ানী একটু অধৈর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, কি, চুপ করে আছ কেন? আমায় নিয়ে পালাতে তোমার আপত্তি আছে?

না, আপত্তি থাকবে কেন? এবার তাড়াতাড়ি তাকে আশ্বস্ত করলাম, কিন্তু সত্যি এমন পালাবার পথ কি আছে? দেখাতে পারো?

দেওয়ানী মিথ্যে কথা বলেনি। সত্যিই এমন গুপ্ত পথ সে দেখালে যার হদিশ না জানা থাকলে সাধারণভাবে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাদের এখনকার বাসায় গিয়ে উঠবার আগে ছেলেবেলায় এই বাড়িতেই থাকত বলেই এ গোপন পথের খবর নাকি সে জানতে পেরেছিল।

গুপ্ত পথটা খুব একটা অদ্ভুত কিছু প্যাঁচের না হলেও মুখোশধারী পাহারাদারদের চোখে ধুলো দেবার পক্ষে যথেষ্ট। চোরাই মাল জমা করা ঘরটার বাহারি কাজ করা একটা ট্যাপেস্ট্রীর পিছনে একটা দেয়াল আলমারী। সে দেওয়াল আলমারীর পাল্লা খুলে পিছনের তাক-

গুলো একটু এদিক ওদিক ঠেললেই সেগুলো ডাইনে বাঁয়ের খাঁজে ঢুকে গিয়ে একটা বেশ চওড়া সুড়ঙ্গপথই বার হয়ে আসে। সে সুড়ঙ্গ পথ বাড়ির তলা দিয়ে গিয়ে অন্যদিকের সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি গলিতে নাকি বেরিয়েছে।

গুপ্ত পথের হদিশ জানবার পর এক মুহূর্ত যে আর নষ্ট করলাম না, তা বলাই বাহুল্য। ঘুমন্ত জোয়ালা আর পরাশরকে জোর করে জাগিয়ে তাদের একরকম জবরদস্তিতে নিচে ঠেলে নিয়ে এসে গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ ঢাকা দেয়াল আলমারীর সেই পাল্লা দুটো ম্যাজিক দেখাবার মত করে গর্বভরে খুলে ধরলাম।

কিন্তু ম্যাজিক যা হল তা একটু ভিন্ন রকমের। পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র টর্চের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, তারপর এক এক করে চারজন মুখোশধারী পাহারাদার সেখান থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল।

এটা! এটা কি ব্যাপার? জোয়ালাপ্রসাদ অসহায়ভাবে একবার আমার আর একবার পরাশরের দিকে তাকিয়ে বললে, এ তো ওই মেয়েটাকে আমাদের জব্দ করবার ফাঁদ মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ ফাঁদ তো নিশ্চয়ই! পরাশর একটু হেসে বললে, তবে একটু কাঁচা হাতের।

কাঁচা হাতের! জোয়ালার মত সবিস্ময়ে আমিও পরাশরের দিকে তাকালাম। কিন্তু আলোচনাটা আর চালানো গেল না।

মুখোশধারীদের সর্দার ধমক দিয়ে আমাদের থামিয়ে জোয়ালাকেই প্রথম সবার বাইরে নিয়ে চলে গেল। আমাদের পালাবার ষড়যন্ত্রের জন্যেই যে সকলকে একসঙ্গে থাকতে না দেওয়ার এই শাস্তি সে কথাও জানিয়ে গেল।

আমায়, আমাকেই একলা নিয়ে যাচ্ছে যে? বলে জোয়ালা তাকে ধরে নিয়ে যাবার সময় আমাদের কাছেই করুণ আবেদন জানালো।

তাতে পরাশর অমন একটা জবাব দেবে ভাবতে পারিনি। কেমন একটু হেসে সে বলেছিল, নিয়ে যাচ্ছে যাক্! কিন্তু আমার হিসেবে যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে বেশী দূর তোমায় যেতে হবে না।

তার মানে! জোয়ালের চোখ দেখেই বোঝা গেছিল যে যত ভক্তিই থাক এ সময়ে পরাশরের হেঁয়ালি তার ভাল লাগেনি।

পরাশর কিন্তু নির্বিকারভাবেই বলেছিল, মানে এই যে এখান থেকে দু' পা বেরিয়েই আবার তোমাদের ফিরতে হবে।

* * * *

যা বলেছিল তাই অমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে কে জানত! পাঁচ মিনিট না যেতে যেতে সত্যিই জোয়ালাপ্রসাদ আবার ফিরে এল। কিন্তু সঙ্গে শুধু তো মুখোশধারীরা নয়, কজন অন্ধ পুলিশ আর তাদের অফিসারও যে এসেছেন। কেন?

আমরা তখনও অন্য মুখোশধারীদের পাহারায় নিচের মহলেই আছি। প্রায় দিশেহারা চেহারায় ভেতরে ঢুকে পরাশরের কাছে সেই কথাই জানতে চাইলে জোয়ালাপ্রসাদ।

আচ্ছা, এ'রা এই সব মুখোশধারী দুশমনদের সঙ্গে আমাকেও ধরেছেন কেন ভর্মাজী? আপনি তো আমায় চেনেন। আমার হয়ে একটু বলবেন এদের—

নিশ্চয়! নিশ্চয় বলব—পরাশর উদারভাবে আশ্বাস দিলে। তারপর পুলিশ অফিসারকে অনুরোধ করে কাছে বসিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনারা যাঁকে ধরেছেন তাঁর সঠিক পরিচয় জানেন কি? —ভুল কিছু করেননি তো?

ভুল কি ঠিক জানি না।—স্বীকার করলেন অফিসার, তবে ওপর মহলের হুকুমে ক'দিন ধরে এ মোকানের ওপর নজর রেখে আজ এ'কে ধরতে হয়েছে।

ধরেই যখন ফেলেছেন তখন ওঁর পুরো পরিচয়টা শুনে নিন—পরাশর এবার যা বলতে শুরু করলে তাতে সবার আগে চোখ কপালে উঠল আমারই,—ওঁর নাম জোয়ালাপ্রসাদ পণ্ডিত। কলকাতা এবং সারা ভারতবর্ষের বিখ্যাত বিরল সব শিল্পসামগ্রীর কারবারী রামস্বরূপ পণ্ডিতের উনি আপন ভাইপো ও একমাত্র উত্তরাধিকারী। রামস্বরূপজীর শ্যালকের এক ছেলে আছে, রতনচাঁদ তার নাম। সেই রতনচাঁদই জোয়ালাপ্রসাদের জীবনের শনি। ইতিমধ্যে কাজকর্মের বাহাদুরী দেখিয়ে রামস্বরূপজীকে সে বশ করেছে, শেষ পর্যন্ত কারবারের মালিকানাতেও সে ভাগ বসাতে পারে, জোয়ালাপ্রসাদের এই বোধহয় ভয়। জোয়ালাপ্রসাদ মুখ বুজে কিছু সইবার পাত্র নয়, চাচাজী আর রতনচাঁদের ওপর শোধ নেবার জন্যেই বোধহয় জোয়ালা-

প্রসাদ বহুদিন ধরে কারবারের মালপত্র বিদেশে পাচার করতে শুরু করেছে, আমার গতিবিধির ওপর নজর রাখবার জন্যে আমার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে...

কি বলছ কি তুমি পরাশর!—এবার আর বাধা দিয়ে প্রতিবাদ না করে পারলাম না, জোয়ালার ডিটেকটিভ গল্প লেখার নেশা, সে তাই ছাপাবার লোভে আমার অফিসে এসে আমার সঙ্গে ভাব করেছে। সেখান থেকে আলাপ হয়েছে তোমার সঙ্গে। ও তোমায় ভক্তি করে।

হ্যাঁ ভয়ে ভক্তি! হাসল পরাশর। রামস্বরূপজী তাঁর দোকানের দামী সব জিনিস লোপাট হতে থাকার পর আমার পরামর্শ চান। আমায় সেখানে দেখবার পর থেকেই ডিটেকটিভ গল্প লেখার নামে আমাদের সঙ্গে ভাব জমাবার বুদ্ধি জোয়ালার হয়েছে। ভাষায় না লিখতে পারুক বাস্তবে জবর এক গোয়েন্দা কাহিনীকে রূপ দেবার চেষ্টাই করেছে জোয়ালা। কলকাতা থেকে ধাপধাড়া দূরের শহরে তার চোরা কারবারের ঘাঁটি করেছে, দেওয়ানী আর তার বাবাকে টাকা খাইয়ে হাত করে দর্পণা দেবীর পুজো আর জাতিস্মর সর্বজ্ঞ হবার বুজরুকি দিয়ে আসল ব্যাপার ঢাকা দিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। এখানকার এক উর্দু কাগজে মিথ্যে একটা খবর ছাপিয়ে তারই কাটিং আমার কাছে পাঠিয়ে আমি এ ব্যাপারে সত্যি কতটা ওয়াকিবহাল তা পরীক্ষা করতে চেয়েছে, তারপর আমি সত্যিই এখানে এসে হাজির হওয়ার পর ব্যাপারটা গোলমেলে বুঝে আমাদের কিছুকালের মত মুখ বন্ধ করবার জন্যে নিজে নজরবন্দী সেজে আমাদেরই ধরে রাখবার ব্যবস্থা করেছে। আমি অবশ্য ইচ্ছে করেই তার এসব ফন্দি না বোঝবার ভাণ করেছি। সস্তা গোয়েন্দা গল্পের মত মুখোশধারীদের দিয়ে শহরের রাস্তা থেকে আমাদের ধরে আনাবার সময় হাসি চেপে এ নাটকে অভিনয় করেছি ঠিক মতই। তবে কাজের কাজ কিছু ভুলিনি। ইন্টারপোলের বড় ঘাঁটি লণ্ডনের দুশো পঁয়ষট্টি নম্বরে আগেই সব চোরাই মালের বিবরণ পাঠিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। এখানে এসেও কাল পর্যন্ত ঠিক জায়গায় নিয়মিত খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। কদিন থেকেই অবশ্য বুঝতে পারছিলাম যে জোয়ালা চারিদিকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেশ ভড়কে গিয়ে দেওয়ানীকে নিয়ে তার মালপত্র আর আমাদের ফেলেই পালাবার মতলব করছে। আজ ভোররাত্রের এই চালাকির পর তারই মাইনে করা মুখোশধারীদের

হাতে বন্দী হয়ে যাবার ছলে সে যে সরে পড়ছে তা বুঝে তার ফিরে আসতে বাধ্য হওয়ার ওই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। আমার খবর-গুলো ক'দিন ধরে যথাস্থানেই পোঁচেছে এ বিশ্বাস আমার ছিল।

আমি যখন এই ব্যাখ্যা শুনে হতভম্ব, জোয়ালাপ্রসাদ কি তখন পরাশরের ওপর খাপ্পা? মোটেই না। সব শুনে সত্যিকার ভক্তি-গদগদ গলায় সে বললে—হ্যাঁ, আমি সত্যিই হাঁদারাম। আপনার ঘুড়ি ওড়ানোর মর্ম আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল, আচ্ছা, আর আমার বড় ভুল কি বলুন তো?

ভুল একটা 'আই', বললে পরাশর, রামস্বরূপজীর হয়ে পাঠানো টেলিগ্রাফেও তুমি রিটার্ণ বানান করেছ 'আই' দিয়ে। ও ভুলটা তোমার মার্কা-মারা নিজস্ব। আর কিছু না থাকলে ওই 'আই'-ই তোমায় ধরিয়ে দিত।
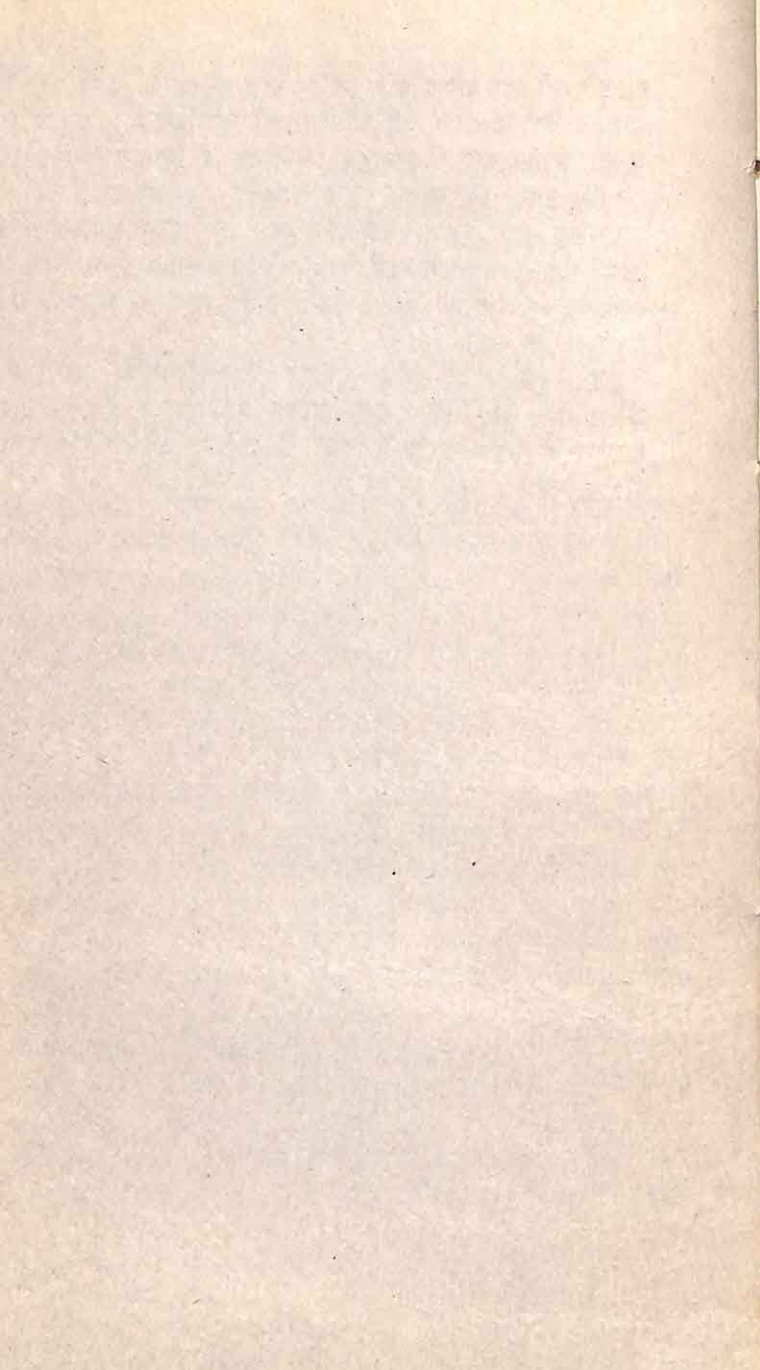
ঘোড়া কিনলেন পরাশর বর্মা

কি কুক্ষণে যে রাজী হয়েছিলাম। নাকের জলে চোখের জলে হতে হতে পরাশরকে যেমন মনে মনে শাপ দিয়েছি নিজেকেও ধিক্কার দিয়েছি তেমন।

এতদিন ধরে পোড় খেয়েও এখনো আমার আক্কেল হল না! পরাশরের কথায় ভুলে তার মন্ত্রণায় সায় দিয়েছি?

মন্ত্রণাটা কিসের? ভাবতে পারেন অনেকেই।

না, নিলেম ঘরে যাওয়া নয়, চেঞ্জে কোথাও তার ক্ষেপে ওঠা ক্যামেরার শিকার হবার কি ভাঙা রেডিও শুনতে বোম্বাই যাবারও নয়।

এই দু'পা মাত্র গিয়ে একেবারে হাতে স্বর্গ পাবার মন্ত্রণা। কি লোভই না দেখিয়েছিল পরশর!

হাঁফ ধরে গেছে এই দেয়ালঘেরা ছাদেঢাকা জীবনের জেলখানায়? অরুচি ধরেছ এই লাইন পাতা ছকবাঁধা রাস্তায় হেঁটে ছুটে ঝুলে? চলে এস উদোম মাঠে আকাশের তলায় ঘণ্টা কয়েকের একেবারে অবাধ ছুটিতে। আরব বেদুইনের উধাও দিগন্তের হাতছানির সঙ্গে আলাদীনের পিদিম-ঘসা জীবনের অফুরন্ত মেহেরবানির পাণ্ড। যেমন—রূপের হাট তেমনি স্ফূর্তির গড়ের মাঠ।

হ্যাঁ, গড়ের মাঠই সত্যি, ঘোড়া ছোটার রেসকোর্স। পরাশর পঞ্চমুখে সেখানকার পাঁচালি গেয়ে এক রকম সম্মোহিত করেই নিয়ে গিয়েছিল সেখানে।

যাবার আগে তবু একবার মনের দ্বিধাটা জানিয়েছি। একবার ওখানে গেলে আর নাকি ছাড়ান-ছিড়েন নেই। এমন নেশায় পেয়ে যায় যে ওই ঘোড়ার পেছনেই ছুটতে হয় তারপর?

পাগল হয়েছ? পরাশর আশ্চর্য করে দিল, আমরা কি ছোটাছুটি করতে পারছি? আমরা শুধু যাচ্ছি দর্শক হয়ে একটি জায়গায় বসে বসে ঘোড়ার ছুট আর টাকার হরির লুঠ দেখব, সেই সঙ্গে সুন্দর চেহারাও যা ফাউ মেলে।

—তুমি আবার ওই যাকে বলে বাজি-টাজি ধরে জুয়াটুয়া খেলবে না তো;—আরো নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছি।

বাজি ধরব আমি! পরাশর যেন অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে ব্যাগ খুলে দেখিয়েছে।—মিঃ চৌহানের গাড়িতে যাচ্ছি বলে ট্যাক্সি ভাড়াটা পর্যন্ত নিইনি।

এরপর আর আপত্তি করা যায়? সরল বিশ্বাসে তার সঙ্গে মিঃ চৌহানের পাঠানো গাড়িতে গিয়ে উঠেছি। গাড়িতে উঠেই মিঃ চৌহান কি দরের মানুষ তা বুঝতে দেরী হয়নি। বিদেশী, কোন কনস্যুলেটের নামে-মাত্র হাতফেরতা ডিল্যুক্স গাড়িতে চড়বার সৌভাগ্য আগেও হয়নি এমন নয়, কিন্তু এ গাড়ি সেসবের ওপর আরেক কাঠি। এমনিতে ছোটখাট একটি স্টীমার বললেই হয়। পিছনের সীটেও আমার মত ওসারে প্রসারে বেশ ভারিক্কি মানুষ অনায়াসে হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারে, তার ওপর আবার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত।

সত্যি কথা বলতে গেলে রেসের মাঠে যাবার প্রথম অভিজ্ঞতাটা খুব খারাপ লাগেনি। মিঃ চৌহানের বোর্ড লাগানো গাড়ি। উত্তরের গেট দিয়ে একেবারে ভেতরে গিয়েই থেমেছে। ইউনিফর্ম-পরা ড্রাইভার নেমে এসে দরজা খুলে ধরার পর বাইরে পা দিয়ে যেন অন্য রাজ্যেই এসে পৌঁছেছি বলে মনে হয়েছে।

গায়ে গায়ে লেপটানো দমবন্ধ করা ঘেঁসাঘেঁসির জগৎ থেকে এ যেন সত্যিকারের মুক্তি। পরাশর যখন কড়কড়ে ছখানা নোট গুণে দিয়ে ষাট টাকায় দুটো মেম্বারের ব্যাজ নিয়ে বোতামে লাগিয়ে দিয়েছে তখন একটু অস্বস্তি লাগলেও সেটা বেশিক্ষণ থাকেনি।

গেট পেরিয়ে ভেতরে যেতে যেতে শুধু পরাশরকে একবার জিজ্ঞাসা করেছি, এখানে ঢোকবার মাশুল এক একজনের ত্রিশ টাকা?

খুব বেশি মনে হচ্ছে? পরাশর হেসে বলেছে, তাও এখানকার মেম্বারের বন্ধু বলে ঐ টাকায় ঢুকতে পাচ্ছ, নইলে ত্রিশ দশকে তিনশো হলেও মেম্বারদের খাস 'এ এনক্লোজারে' উট্‌কো কোন লোকের ঢোকবার উপায় নেই।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় একটু সন্দিগ্ধভাবে এবার জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি যে তখন ব্যাগ খুলে কিছু নেই দেখালে, এ টাকা তাহলে পেলে কোথায়!

পেলাম পকেটে। পরাশরের মুখের হাসি দেখে ভবিষৎ তখনই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল,—তোমায় ব্যাগটাই খুলে দেখিয়েছি পকেট তো নয়।

ব্যাপারটা তখন হাসিঠাট্টার মেজাজেই নিয়েছি। রেসের মাঠের কাণ্ডকারখানা দেখেই তখন আমি তাজ্জব।

পরাশর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখিয়ে দিয়েছে। কোথায় ঘোড়ার নম্বর আর জকির নাম উঠছে ঘোড়া কোন্ খোপে দাঁড়াবে তার নম্বর শুদ্ধ, কোথায় প্রকাণ্ড কালো বোর্ড রয়েছে কোন্ ঘোড়ার কত বিক্রী তা জানবার জন্যে, কোথায় টিকিট কেনবার জানালা আর কোথায় জিতলে টাকা নেবার, ঘোড়া কোথায় প্যাডকে ঘুরিয়ে দেখানো হয়, আর, মেম্বারদের মহল থেকে বেরিয়ে কোথায় বুকিরা আলাদা যেন ফাঁদ পেতে বসে তাদের নিজের নিজের বোর্ডে ঘোড়া পিছু তার দর লিখে জানিয়ে মক্কেল তাতাচ্ছে—এত সব দেখতে দেখতে মাথাটা একটু ঘুরেই গেছে সত্যি, পরাশরকে সে কথা জানিয়ে বলেছি, একসঙ্গে যতটা সয় তার বেশি চাপিও না। আপাতত আসল ঘোড়দৌড় যেখান থেকে দেখা যায় সেইখানে একটু নিয়ে গিয়ে বসাবার ব্যবস্থা কর।

আরে সে তো আমাদের জন্যে মিঃ চৌহানের বক্সই আছে—আশ্বাস দিয়েছে পরাশর, কিন্তু এখন থেকে সেখানে গিয়ে বসে থাকবে কেন? মিঃ চৌহান এলে তাঁর সঙ্গেই যাব।

চৌহান এখনো আসেন নি! আমি একটু অবাক হয়েছি। না ওঁর একটা জরুরী কাজ সেরে আসছেন—বলেছে পরাশর, রেস আরম্ভ হতে এখনো অনেক দেরী, টিকিটের উইনডো খোলেনি। রেস্তোরাঁয় গিয়ে একটু বসা যাক চল। ঘোড়ার ফর্ম টর্ম একটু কষা যাবে।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটা টেবিলে গিয়ে বসবার পর পরাশরের শেষ কথাটার মানে বুঝেছি। পরাশর তখন দুটো কোল্ড ড্রিঙ্ক অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে রেসের একটা বই বার করেছে। এ বই কখন সে কিনেছে জানতেও পারিনি।

পরাশর যতক্ষণ রেসের বই নিয়ে তন্ময় থেকেছে ততক্ষণ আমি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছি।

আমরা একটু আগেই এসে পড়েছিলাম। তখনও 'এ এনক্লোজার' অনেক ফাঁকা ছিল। আসল মক্কেলরা এইবার আসতে শুরু করেছে। টিকিট বিক্রির ইমারতের সামনে যেখানে বসে আছি সেই রেস্তোরাঁয়

দলে দলে এ রাজ্যের কারবারীরা ঘুরছেন-ফিরছেন, জটলা পাকাচ্ছেন বা বসে আড্ডা দিচ্ছেন।

চাঁদের হাট সত্যিই। কি সব চেহারা, আর তার চেয়ে বেশি কি পোশাক। ফ্যাশান প্যারেড যদি দেখতে হয় তাহলে মাঠে মেম্বারদের এই খাসমহলে। শহরের হুরী পরীরা কেউ যেন বাদ নেই। আর পোশাক প্রসাধনের ঘটায় সুরলোকও লজ্জা পাবে। লজ্জা অবশ্য সব দিক দিয়েই। পোশাকটা যে আবরণের অছিলার চেয়ে উন্মোচনের ইশারার জন্যে, সুর-সুন্দরীরাও তা বোধহয় জানেন না। পুরুষ যাঁরা সঙ্গে আছেন তাঁদেরও সাজের ত্রুটি নেই কিন্তু সে তো শুধু সানাই-এর বাঁশির বিচিত্র বিস্তারের পেছনে পোঁ ধরার মত।

রেস্তোরাঁর বয় এসে দুজনের সামনে পানীয়ের গ্লাশ ধরে দেবার পর পরাশর ও আমার দুজনেরই যেন ঘোর কেটেছে। পরাশরকে বই থেকে মুখ তুলে গেলাসটা দেখে পকেট থেকে একটা রসীদ বইয়ের মত বের করতে দেখে আমি তখন অবাক। সে বই থেকে দুটো পাতা ছিঁড়ে বয়কে দেওয়াতে আরো।

ওটা আবার কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করেছি।

দাম দিলাম আমাদের কোল্ড ড্রিঙ্কের, পরাশর বুঝিয়েছে, আজকাল আর নগদ দাম দেওয়া নেই। সই করেও কিছু নেওয়া যায় না। আগে থাকতে এই ধরনের কুপন বই কিনে রাখতে হয়।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ কুপন বই তুমি পেলে কোথায়? এখানে এসে তো কেননি? প্রশ্নটা ঠিকই করেছিলাম। কিন্তু তখনও যদি পরাশরের আগে থাকতে সাজানো প্ল্যানটা আঁচ করতে পারতাম!

না, কিনতে যাব কেন?—পরাশরই যেন অবাক হয়ে বলেছে মিঃ চৌহান তো কালই সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। আমায় বুঝিয়ে পরাশর তার হাতের রেসের বইটা, এবার আমার সামনে খুলে ধরেছে!—দেখতে পাচ্ছ?

দেখব আর কি, ও তো রেসে যারা দৌড়বে, সেই ঘোড়া আর জকিদের নাম।

শুধু তাই দেখছ! আমার পেন্সিলের দাগ দুটো দেখতে পাচ্ছ না?

পেন্সিলের দাগ মানে? এবার হেসে ফেলে বলেছি, ওই ঘোড়াগুলো জিতবে বলে তোমার ধারণা?

ধারণা নয়, হিসেব। গম্ভীর হয়ে বলেছে পরাশর, অব্যর্থ অঙ্কের হিসেব।

অঙ্কটা কি? আমার গলায় বিদ্রূপটা অস্পষ্ট রাখিনি। শুনবে তাহলে? পরাশর অংক বোঝাতে ব্যস্ত হয়েছে, আজ কত তারিখ?

বারো, একটু অবাক হয়ে বলেছি, তারিখ দিয়ে কি হবে?

দেখ না। কিন্তু শুধু বারো বললেই হবে না। বল বারোই ডিসেম্বর, উনিশশো সত্তর।

বললাম। কিন্তু তাতে হল কি?

হল এই যে পয়লা বাজিতে কোন্ ঘোড়া জিতবে তা জেনে ফেললাম।

ওই তারিখ থেকে?—আমার হাসিটা আর চাপতে পারিনি। শুধু তারিখ থেকে নয়, পরাশর নির্বিকার, হিসেবটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, প্রথমে বারোই ডিসেম্বর উনিশশো সত্তর যোগ কর। তারিখ আবার যোগ করব কি করে! এবার আমি হতভম্ব।

আহা তারিখ নয়। তারিখের নম্বরগুলো। পরাশর বুঝিয়েছে, বারোই হল তারিখ, ডিসেম্বর হল বারো, বারো বারোতে চব্বিশ আর উনিশশো সত্তর-এর নম্বরগুলো যোগ করলে হয় সতেরো। সতেরো আর চব্বিশ.........

এবার অধৈর্যের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছি, কি আবোল তাবোল বকছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি রেসের মাঠে এসে!

খারাপ হবে কেন? এই নম্বরগুলো যোগ করছি বলে? বেশ, প্রমাণ যখন করে দেব তখন তো বুঝবে?

কি প্রমাণ! ওই যোগ করে তুমি জিতের ঘোড়া ধরে ফেলবে!

ফেলব কেন, ফেলেছি। পরাশর গর্বভরে বলেছে, আমাদের সতেরো আর চব্বিশে হয়েছিল একচল্লিশ, তার সঙ্গে পয়লা নম্বর রেসের এক যোগ কর। তাহলে দাঁড়াল বিয়াল্লিশ। বিয়াল্লিশের চার আর দুই যোগ করলে হয় ছয়। পয়লা রেসে ছয়' নম্বর ঘোড়া মেডোসুইট নির্ঘাৎ জিতছে। এই নাও টাকা।

পকেট থেকে সত্যিই একটা দশটাকার নোট বার করে দিয়ে পরাশর বলেছে, টিকিটের জায়গা দেখিয়ে দিয়েছি। সেখান থেকে প্রথমেই গিয়ে একটা ছ' নম্বরের জিতের টিকিট কাটবে।

টাকাটা হাতে নিয়ে সত্যিই আমি তখন হাঁ হয়ে গেছি। সেই হাঁ হয়েই থাকতে হয়েছে তার পরও।

আরে! আমার হাতে নোট আর রেসের বইটা গুঁজে দিয়ে পরাশর হঠাৎ যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে মহিলাটিকে দেখতে পেয়েছি এবার। দেখবার মতই চেহারা, সাজটা তার চেয়েও।

তন্বী দেহ। টকটকে ফর্সা নয় বলেই যেন গায়ের রঙের উজ্জ্বলতা আরো মনোহর। সে মাধুরী উপভোগ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ তাঁর সাজের কেরামতিতে দেওয়া হয়েছে। ক্ষীণ কটি নিয়ে দেহের মধ্যভাগ পুরোপুরিই নিরাবরণ। পরিধেয়টি যে ভাবে পরা তাতে ভয় হয় নিতম্ব থেকে খসে পড়তে বুঝি আর দেরি নেই। চোখ মুখ নাক দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গেই ছন্দে মেলানো। আর তারই ওপর মাথায় একটি ঘড়ার মত খোঁপার বাহার।

শুধু পরাশর বা আমার নয়, রেস্তোরাঁ আর তার বাইরের লনের সব টেবিলের দৃষ্টিই তখন সুন্দরীর দিকে।

হেঁটে নয়, রাজহংসীর মত তিনি যেন লন পার হয়ে রেস্তোরাঁর হলের ভেতর ভেসে এসেছেন। তারপর আমাকে তো বটেই আশে-পাশের অনেককেই বোধহয় তাজ্জব করে বীণাবিনিন্দিতকণ্ঠে, হ্যালো পরাশর! বলে আমাদের টেবিলের দিকেই এগিয়ে এসেছেন।

পরাশর আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবার আমাকেও উঠতে হয়েছে। এ হেন মহিলার সঙ্গে পরিচয় হতে যাওয়ার ঔৎসুক্য আশঙ্কার সঙ্গে একটা ভাবনাই তখন মনের মধ্যে প্রধান। ভদ্রমহিলার পরাশরকে সম্বোধনটায় সত্যিই চমকাতে হয়েছে। পরাশরের চেনা জানা মহল খুব ছোট নয় তা জানি। এমন একজন সুন্দরী মহিলা তার মধ্যে থাকা একেবারে আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন মহলের কাউকে পরাশরকে নাম ধরে ডাকতে তো শুনিনি। বর্মা শব্দটাই বিকৃত উচ্চারণে ভার্মা ভের্মার মত অনেক কিছু হয়েছে অনেকের মুখে। কিন্তু এ মহিলা যে একেবারে নাম ধরে ডাকে! এর সঙ্গে এত পরিচয়ই বা পরাশরের হল কখন? আর কিছু ভাববার সময় মেলেনি। মাঝপথে পরিচিত আর একটি টেবিলের ক'জনের সঙ্গে কুশল সম্ভাষণ সেরে সুন্দরী তখন আমাদের কাছেই পৌঁছে গেছেন। এসেই পরাশরের হাত ধরে সানন্দে নাড়া দিয়ে নিখুঁত ইংরেজি

উচ্চারণে বলেছেন, তোমায় দেখে খুব খুশি হলাম পরাশর, কিন্তু সেই সঙ্গে না বলে পারছি না যে এখানে তোমায় দেখব আশা করিনি।

আমিও আশা করিনি তোমায় এখানে একলা দেখব। পরাশর হেসে বলেছে, দাঁড়াও, আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমায় পরিচয় করিয়ে দিই আগে। মিস রঞ্জা কৌশল, বিখ্যাত ফ্যাশান ডিজাইনার, আর আমার বন্ধু মিঃ কৃত্তিবাস ভদ্র।

এবার আর হাত ধরে ঝাঁকানি নয়, শ্রীমতী রঞ্জা হাত তুলে শুধু নমস্কার জানিয়েছে আর তার পরের মুহূর্তেই আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ যেন ভুলে গিয়ে পরাশরকে বলেছে, সত্যি, তোমার এসব বদখেয়াল তো কখনো দেখিনি পরাশর। তুমি হঠাৎ রেসের মাঠে কেন?

তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে! প্রথম ঠাট্টা করলেও তারপর সুরটা বদলে পরাশর জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু তুমি কি সত্যি একা এসেছ! চৌহানকে দেখছি না কেন?

কপট রাগের ভান করেছে এবার রঞ্জা, চৌহান কি আমার হ্যাণ্ডব্যাগ যে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে! আমি চৌহানের সঙ্গে আসিইনি।

আচ্ছা! আচ্ছা! রাগ করছ কেন? পরাশর হেসে শান্ত করেছে, বস একটু। বসে মাথা ঠাণ্ডা কর। কি অর্ডার দেব বল।

না না, কিছু অর্ডার দিতে হবে না। এবার হেসেই বলেছে রঞ্জা, আমি রাগ করিনি। কিন্তু এখন বসতে পারব না। বুকিদের মহলে একবার আমায় যেতেই হবে। আমাকে একজন খুব ভাল টিপ্‌স দেবে বলেছে।

ভাল টিপ্‌স তো আমিও দিতে পারি। ঠাট্টার সুরে বলেছে পরাশর, তবু হতাশ হবার সুযোগ থেকে তোমায় বঞ্চিত হতে দিতে চাই না। আমি সঙ্গে গেলে তোমার আপত্তি নেই আশা করি।

না না, আপত্তি কিসের। লীলায়িত ভঙ্গি করে বলেছে রঞ্জা, তোমায় সঙ্গী পাওয়া তো একটা সৌভাগ্য। এস তাহলে, আচ্ছা নমস্তে মিঃ ভদ্দর।

মধুর সুবাসের সঙ্গে হিল্লোলিত দেহের যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ ছড়িয়ে রঞ্জা পরাশরের সঙ্গে চলে গেছে। যেতে যেতে একবার পিছু ফিরে পরাশর চোখের ইশারায় বই দেখে টিকিটটা কেনবার কথাই যে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি।

আমার শাস্তি তখন থেকেই শুরু।

রঞ্জা ও পরাশর চলে যাবার পর সত্যি বলতে গেলে একটু ক্ষুব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। এই প্রথম আমি এখানে এসেছি। আমাকে সঙ্গে করে এনে এমন ভাবে হঠাৎ ফেলে যাওয়া কি পরাশরের উচিত হল!

মেয়েদের সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা নিয়ে তো সুবিধে পেলেই খোঁচা দেয়। কিন্তু নিজের বেলা? দেহের বাঁধুনি আর চেহারা দেখে এক মুহূর্তে সব ভুলে গেল।

ফ্যাশান ডিজাইনার? ফ্যাশান ডিজাইনার মানে তো শাড়ি ব্লাউজের দোকানের হয় মালিক, নয় দর্জি। তাকে নিয়ে অত আদিখ্যেতা কিসের!

কিন্তু মনে মনে গজরালেও পরাশরের কথাটা না রেখে তো পারা যাবে না। প্রথম রেসের ছ'নম্বর ঘোড়ার টিকিট কিনতেই গেলাম।

টিকিট কেনাটায় খুব হাঙ্গামা হল না। টিকিটের জানালায় তেমন ভিড় নেই। বেশ একটি সুন্দরী মেয়ে ওধারে বসে। নম্বরটা বলতে টাকাটা নিয়ে একটা চাকি-গোছের ঘুরিয়ে বোতাম টিপতেই টিকিট কেটে বেরিয়ে এল।

নম্বরটা একবার দেখে সেটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু পরাশরকে এখন তো পাওয়া দরকার। আমায় শুধু টিকিটটা কেনবার ইশারাই করে গেছে শেষ মুহূর্তে। কিন্তু নিজে কোথায় থাকবে তা তো কিছুই বলে যায়নি। তা না যাক্। এমন কিছু ফুটবলমাঠের ভিড় নয়। খুঁজে তাকে পাব নিশ্চয়ই।

প্রথমটা সত্যিই তেমন ভাবনা হয়নি। এদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটু শুধু নজর রেখেছি মাত্র, সে তো একলা নয় সঙ্গে শ্রীমতী রঞ্জাও আছেন, হাজার জনের ভিড়েও সে রূপ আর সাজসজ্জা চোখ এড়াবার নয়।

কিছুক্ষণ বাদে বাদে দু-দুবার বেল বেজে গেছে। কিছু না জানলেও ঘণ্টাধ্বনি যে জুয়াড়ীদের তাড়া দেবার সেটুকু বুঝেছি। গোলাকার প্যাডকের রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। রঙ-বেরঙের রঙীন শার্ট ও ক্যাপ পরা বেঁটে-বেঁটে জকিরা তখন ঘোড়া-গুলোতে উঠতে শুরু করেছে। কাছে প্যাডকের ভেতর আরো সব ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ভিড় করে আছেন। পরাশর গোড়াতেই একবার

বুঝিয়ে দিয়েছিল যে ও জায়গায় ঢুকতে পারে শুধু ঘোড়ার ট্রেনার মালিকপক্ষ জকি আর সহিসেরা। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা মালিকপক্ষ বলেই বুঝলাম।

সহিসের লাগাম ধরা অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে প্যাডকটায় চক্কর দিয়ে জকিরা প্যাডক থেকে কোর্সের দিকে বেরিয়ে গেল। প্যাডক থেকে কিছুদূর পর্যন্ত রেলিঙের দুধার থেকে সাদা রঙের রশি টেনে ধরা হয়েছে। ঘোড়াগুলো তারই ভেতর দিয়ে গিয়ে ছোটার কোর্সের রেলিঙের ভেতর ঢুকল। মাইকে তখন ঘোড়ার নাম নম্বর আর জকিদের পরিচয় ঘোষণা হচ্ছে।

ঘোড়াগুলো বেরিয়ে চলে যাবার পর প্রথম একটু যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। সত্যি, এতক্ষণেও পরাশরের দেখা নেই কেন? আমার সম্পর্কে তার একটা দায়িত্ব তো আছে! আমায় টিকিট কিনতে বলে সে যে সুন্দরী রঞ্জার সঙ্গে চলে গেল তারপর আমার কথা ভুলেই গেল নাকি! আমি যে এ রাজ্যে একেবারে নতুন আর আনাড়ী সে কথা তার মনে রাখা উচিত ছিল।

একেবারে জলে পড়েছি তা আমি অবশ্য বলব না। তেমন দরকার হলে কোর্স থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাবার কোন বাধা আমার নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে এসে তারপর এমন উধাও হয়ে থাকা কি তার উচিত?

কিন্তু সত্যি কোথায় বা সে থাকতে পারে? হঠাৎ মনে পড়ল যে চলে যাবার সময় বুকিরা যেখানে থাকে সেইখানে কোথায় যেন যাবার কথা বলেছিল। সেই দিকেই এবার গেলাম।

কিন্তু সে তো একেবারে মেছো হাটা!

মাইকে তখন ঘোড়াগুলোর স্টার্টিং নেটে পেঁছে যাবার খবর জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে বুকিদের কাছে বাজি ধরবার জন্যে। মাচার মত এক একটা বড় কাঠের চৌকির ওপরে পাতা চেয়ার টেবিল, আর তারই মাথায় লম্বাটে বোর্ডে ঘোড়ার নাম নম্বর জকির নাম আর পর পর কে কোন্ নম্বরে দাঁড়াচ্ছে তার তালিকার পাশে প্রতি ঘোড়ায় বাজির দর কত তা লেখা। চৌকির ওপর জন তিন চার বসে ও দাঁড়িয়ে জুয়াড়ীদের ঢেউ সামলাচ্ছে। একজন ঘড়িহাতে ঘোড়ার দরের ওঠানামা লিখছে আর মুছছে। একজন বাজি যে ধরছে তাকে জিতলে কত পাবে হিসেব দেওয়া

কার্ড লিখে দিচ্ছে। আরেকজন হয়েছে টাকার ভাঁড়ারী। সবশুদ্ধ জড়িয়ে যেন একটা পাগলা গারদের কাণ্ড-কারখানা। এক একটা বুকির চৌকির সামনে যেন ঊর্ধ্ববাহু প্রার্থীর জম্পেশ ভিড়। তবে এত ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি নেবার নয়, দেবার জন্যে।

এই ভিড় কোনরকমে ঠেলে উত্তর দক্ষিণের দু'সারির বুকিদের বুকই ঘুরে দেখলাম। না, পরাশর কি তার সুন্দরী সঙ্গিনী রঞ্জার কোন পাত্তাই নেই।

ওদিকে তখন মাইকে ঘোড়াগুলোর এক এক করে স্টার্টিং স্টল মানে দৌড় শুরু করবার আলাদা খুপরিতে ঢোকার খবর দিচ্ছে।

এই ঢুকল ডেজার্ট ব্লেজ, এবার ত্রিমূর্তি ঢুকেছে। তারপর ভলন্টারি, বারো নম্বর হাফ-এ-কয়েন গোলমাল করছে, ঢুকেছে স্টেটল, তারপর মেডোসুইট, এবার হাফ-এ-কয়েন ঢুকেছে.........

আর তো বুকিদের কাছে অপেক্ষা করা যায় না। এবার তো ঘোড়দৌড় শুরু। মাঝখানের গেট দিয়ে ব্যাজ দেখিয়ে ছুটলাম মেম্বার্স এনক্লোজারের গ্যালারির দিকে। এ সময়ে পরাশর আর তার সঙ্গিনীকে সেখানে পাওয়া যাবে নিশ্চয়। নিজেরও দৌড়টা চাক্ষুষ দেখবার লোভও আছে।

ধাপ দেওয়া বসবার গ্যালারি। ওপরের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে ধারের দিকে বসলাম। বসার আয়েশ পাঁচ সেকেণ্ডও করা গেল না।

মাইকে তখন ঘোষণা করছে, সব ঘোড়া স্টলে ঢুকেছে। স্টার্টার উঠেছেন দৌড় শুরু করাতে।.........

মাঠের দক্ষিণ দিকে চেয়ে দৌড়ের শুরুতে ঘোড়া ভরে রাখবার খাঁচাগুলো তখন দেখতে পাচ্ছি। পাশাপাশি ন'টা তার আর লোহার রডের খুপরি। তার ওপরে স্টার্টারের লাল নিশান দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ সেই লাল নিশান নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎতরঙ্গে একসঙ্গে নটি খাঁচার দরজা গেল খুলে। সব ক'টি ঘোড়াই বেরিয়ে দৌড় শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই মাইকের ঘোষণা শোনা গেল, স্টার্ট হয়েছে। দৌড় শুরু হবার ঘণ্টাও একটা বাজল। তবে অতটা দূর থেকে আসবার জন্যে শব্দটা সেকেণ্ড খানেক পরে পেলাম।

মাইকে তখন দৌড়ের বিবরণ দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। যন্ত্রটায় গলদ আছে, আওয়াজটা খুব স্পষ্ট নয়, কেমন জড়ানো। তবু তার

মধ্যে এইটুকু শুনতে পেলাম যে ভলণ্টারী নামে কোন ঘোড়া এগিয়ে আসছে তার পেছনে আসছে হাফ-এ-কয়েন।

পরাশর যে ঘোড়ার টিকিট কিনতে বলেছে ছ'নম্বরের সেই মেডো-সুইট কই! একটি নামই আমার শুধু জানা।

হ্যাঁ, মেডোসুইটের নামও শুনলাম। স্টল থেকে বেরুতেই ঘোড়াটা দেরি করেছে আছেও পেছনে। থাকবেও নিশ্চয় তাই। পরাশরের অব্যর্থ গণনার পরিণাম ভেবে তখন একটু হাসিই পাচ্ছে।

শুধু তাতেই নয়, হাসি পাচ্ছে মাঠশুদ্ধ লোকের হঠাৎ একেবারে পাগলামির ঢেউয়ে আথাল পাথাল হতে দেখে। ঘোড়াগুলো দক্ষিণের বাঁকটা পার হয়ে ঘুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে কি চীৎকার আর হাত পা ছোঁড়ার ধূম। ঘোড়াগুলো যত এগিয়ে আসে প্রায় সব ক'টা ঘোড়ার নামের উচ্চারণ মেলানো চেঁচানি আর আস্ফালনও সেই সঙ্গে। সেকেণ্ড থেকে শুরু হয়ে গ্র্যাণ্ড আর তারপর মেম্বার্স এনক্লোজার পর্যন্ত।

কিন্তু ওটা কি শোনা যাচ্ছে মাইকে! ছোঁয়াচে উত্তেজনায় আমারও তখন দাঁড়িয়ে উঠে প্রায় হাত পা ছোঁড়ার অবস্থা।

পিছন থেকে সকলকে ছাড়িয়ে কে যাচ্ছে অনায়াসে এগিয়ে!

মাইকে তো শুনছি, মেডোসুইট!

মেডোসুইট! মানে, পরাশরের গুণে বার করা সেই ছ'নম্বর ঘোড়া? হ্যাঁ, মেডোসুইটই জিতল। রেলিংয়ের ওপারে পোস্টে নম্বর টাঙিয়ে তুলল, ছয়। মেডোসুইট! মেডোসুইট! চেঁচাচ্ছে এখানে সেখানে এক একটা দল। আমি তখন ভোম মেরে গেছি। ছ'নম্বরের জেতাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না। একটু সামলাবার পরই পরাশরের জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।

তার ঘোড়া জিতেছে, গণনা সার্থক, এমন সময় সে গেল কোথায়? সেই সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে এমন উত্তেজনাময় মুহূর্তে কোথায় চুপ করে আছে?

আর চৌহান? চৌহানের কথাটা এবার মনে পড়ল। তাঁর দৌলতে তাঁর গাড়িতেই তো এখানে এসেছি। কিন্তু তাঁরও তো এসে অবধি দেখা পাইনি। সত্যিই বড় আশ্চর্য ব্যাপার!

পরাশর এখানে আসবার পরে চৌহানের নিজস্ব একটা বক্সের কথা বলেছিল। কত যেন নম্বর? হ্যাঁ, মনে পড়ল উনচল্লিশ।

উনপঞ্চাশ হলেই ভাল হত বলে ঠাট্টা করেছিলাম বলেই সংখ্যাটা মনে আছে।

বক্সটা একবার দেখলে তো হয়। সেখানে পরাশরকে পেলে আনন্দের সঙ্গে একটু রাগও অবশ্য হবে।

আমাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে তার বক্সে বসে থাকাটা ক্ষমা করতে পারব না। তবু যে কোন ভাবে এখন পরাশরকে পেলেই যে বেঁচে যাই।

সামনের সিঁড়ি দিয়েই ওপরে উঠে গেলাম। এ—জায়গাটা সম্পূর্ণ অচেনা। পরাশর এই ওপরতলাতেই নিয়ে আসেনি। ওপরের বক্স-গুলোর পিছন থেকে সংকীর্ণ করিডর। সে করিডর থেকে পিছন দিকের সিঁড়িতে প্যাডকের দিকে নেমে যাওয়া যায়। বক্সগুলো ছাড়িয়ে প্যাডক যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সামনে আর বাঁ পাশে ওপর থেকে টিকিট কেনবার সব জানালা।

বার ও করিডরে বেশ ভিড়। এখানকার জনতা আরো যেন বাছাই। এঁরা ওপরের বারান্দা থেকেই নিচের প্যাডকের ঘোড়া দেখতে পারেন, পারেন সব রকম টিকিটও ওপর থেকে কিনতে। শুধু বুকিদের কাছে বাজি ধরতে গেলে এঁদের কষ্ট করে নামতে হয়।

এখানকার জনতার মধ্যে পরাশর বা রঞ্জা সুন্দরীর দেখা পেলাম না। উনচল্লিশ নম্বর বক্সেও নয়। বক্সটা খুঁজে বার করতে খুব দেরি হয়নি ; কিন্তু সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটি মেয়েকে বসে থাকতে দেখে প্রথম কিছু জিজ্ঞাসা করতে একটু দ্বিধাবোধ করছিলাম। সে দ্বিধা জয় করবার দরকার হল না। অপরিচিতাদেরই একজন নিজে থেকে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মিঃ চৌহানকে খুঁজছেন? তিনি এখনো আসেননি। আমরাও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

ও! এখনো আসেননি বুঝি—মুখে বিস্ময় প্রকাশ করে সেখান থেকে চলে এলাম। মনের বিমূঢ়তা তখন তার চেয়ে অনেক বেশী।

সত্যি! ব্যাপারটা কি?

মিঃ চৌহানের নিমন্ত্রণে তাঁরই গাড়িতে তাঁরই অতিথি হিসেবে এখানে এসেছি। অথচ সেই মিঃ চৌহানেরই এ পর্যন্ত দেখা নেই! তার চেয়েও আশ্চর্য পরাশরের অন্তর্ধান। শ্রীমতী রঞ্জার সঙ্গে

বুকিদের মহলে যাবার নাম করে সে গেল কোথায়? রেসকোর্স থেকেই উধাও হয়ে গেল নাকি?

পরাশরের জেতা ঘোড়ার টিকিটটার কথা অবশ্য ভুলিনি। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্যাডক ঘুরে এবার সেই টিকিটটা ভাঙাবার জায়গাতে গেলাম। জায়গাটা পরাশর দেখিয়ে দিয়েছিল কিন্তু পদ্ধতিটা তখনো অজানা। সেজন্যে অবশ্য বেশি কিছু অসুবিধা হল না। টাকা দেবার জানালা ক'টায় তখন লাইন পড়ে গেছে, লাইনের পিছনে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আমার সামনে একটি মাঝবয়সী অবাঙালী মহিলা। পোশাক-আশাকে আধুনিক কিন্তু মুখের ছাঁদে আর নাকের নাকছাবিতে রাজস্থানী বলেই মনে হল। পঞ্চনদবাসিনীদের সংখ্যাই এ পর্যন্ত বেশি দেখেছি। রাজস্থানীরা তাদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম, বেশ-ভূষাতেও তাদের উত্তরের প্রতিবেশিনীদের দুঃসাহসের নাগাল ধরতে পারেননি।

পোশাকে প্রসাধনে যেমনই হোন আমার সামনের মহিলা অন্যদিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রগতিশীলা। পরিচয় নেই বলে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে অনায়াসে বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কত দিয়েছে শুনেছেন?

সে আবার কি কথা? প্রশ্নটা যে জিতের টাকা সম্পর্কে তা অনুমান করলেও লভ্যের পরিমাণটা আগেই কোথা থেকে শোনা যেতে পারে তা বুঝতেই পারলাম না।

অপ্রস্তুত ভাবে উত্তর দিতে যখন আমতা আমতা করছি, সংশয় মোচনটা হয়ে গেল তখনই।

লাউডস্পীকারে ঘোষণা শোনা গেল! জানা গেল যে ছ'নম্বর ঘোড়ার জিতের টাকা হল সাঁইত্রিশ আর প্লেসের পনেরো। তারপরের দু'নম্বর আর একনম্বরের প্লেসের টাকা দিয়েছে সাঁইত্রিশ আর দশ।

সামনের জানালা তখন খুলেছে। অগ্রবর্তিনী পাঁচ পাঁচখানা টিকিট হাতে বার করে ধরে তখন আহ্লাদে-আটখানা। উত্তেজিত উল্লাসে আমাকেই শোনাচ্ছেন, খুব ভালই দিয়েছে, কি বলেন? বুকে ছিল তিনের দর, তাও ট্যাক্স দিতে হত চল্লিশে সাত টাকা। তার চেয়ে ভালই পেয়েছি।

কি বা সাতটাকা ট্যাক্স, তিনের দর মানেই বা কি ঠিক না বুঝেও

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে তাঁর পিছনে যেতে যেতে এ সবের মর্ম আর পরাশরের গণনার ভেল্‌কির কথা ভাবতে ভাবতে আমি তখনও পরাশর আর শ্রীমতী রঞ্জনার সন্ধানেই চারিদিকে চোখ ঘোরাচ্ছি।

হ্যালো রঞ্জনা!

চমকে উঠলাম আমার পূর্বগামিনীরই উচ্ছ্বসিত সম্ভাষণে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সম্বোধিতাকেই এবার দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, শ্রীমতী রঞ্জনাই বটে। একেবারে আমার ডানপাশের সারিতে, সারি বলতে মাত্র তিনজন। তার কারণটাও জানালার বোর্ড দেখে বুঝলাম। আমাদের মত দশটাকার নয়, তার অন্ত পাঁচগুণ দামের টিকিটের জানালা। প্রার্থী তাই অত কম। আমার পূর্বগামিনী তখন সোৎসাহে বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ চালাচ্ছেন হিন্দী। বক্তব্যটা হল, খুব মোটা দাঁও মেরেছ দেখছি। কত খেলেছ? এই দুটো টিকিটে মোটে একশ। মিস্ রঞ্জা একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে জানালে। একশতে আশ মেটেনি। আমার পূর্বগামিনীর গলায় ভর্ৎসনা আর অনুশোচনা মেশানো, আমার তো মোটে দশ টাকার একটা টিকিট!

আমি যে আবার বুকে এক নম্বর খেলে মরেছি একজনের ভুল টিপে! রঞ্জাদেবী সখেদে ব্যাখ্যা করলে, সেখানে একশ সাড়ে সতেরো গেছে না!

আর কিছু বলবার সময় পেলে না শ্রীমতী রঞ্জা, তাঁর সামনের প্রার্থীর টাকা নেওয়া তখন হয়ে গেছে। এবার তাঁর পালা। কিন্তু আমি এখন করি কি? আমার পুরোবর্তিনীকে নিয়ে এখনও আমার সামনে তো চারজন। আমি জানালায় পেঁছে টাকা নেবার অনেক আগেই তো মিস্ রঞ্জা তাঁর প্রাপ্য নিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন, তারপর আবার তাঁর পাত্তা কি সহজে পাব? তাঁর সন্ধান পেলেই যে-পরাশরকে ধরতে পারব এ বিষয়ে তখন আর আমার কোন সন্দেহ নেই। রঞ্জাদেবী তো পরাশরকে নিয়ে কোন্ বুকির স্টলে কি অব্যর্থ টিপ নিতে গিয়েছিল! সে টিপ তো বোঝা গেল এই টাকায় টাকা দরের ফেভারিট এক নম্বর, যা কেঁদে ককিয়ে কোন রকমে প্রথম দুজনের পিছনে এসেছে। ছ'নম্বর মেডোসুইট-এর টিকিট মিস রঞ্জা তাহলে পরে পরাশরের কথাতেই কিনেছে নিশ্চয়ই। সেই পরাশরের কাছে একবার কৃতজ্ঞতা জানাতেও কি সে এখন যাবে না!

কিন্তু তাকে অনুসরণ করতে গেলে পরাশরের এ টিকিট ভাঙানো

যে আর হয় না। এ রাজ্য সম্বন্ধে তখনও একেবারেই আমি আনাড়ি। লেট পেমেন্ট-এর আলাদা জানালা যে আছে তা জানা নেই, তখন লক্ষ্য করে দেখবার কথাও মনে হয়নি। জিতের টাকা না নিয়ে পরাশরের খোঁজে অস্থির হওয়াটা উচিত মনে হয়নি তাই। তাছাড়া এবার যখন পেয়েছি তখন রঞ্জাদেবীকে এরপর খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হবেনা মনে হয়েছে। রঞ্জা কৌশল চলে যাবার পর অস্থির হয়ে উঠলাম তাড়াতাড়ি টিকিটটা ভাঙাবার জন্যে। কিন্তু যত বাগড়া জুটল কি ঠিক সেই সময়!

পিছন থেকে এসে এক আহ্লাদী চেহারার মহিলা আমাদের সারির সকলের সামনের প্রার্থীর হাতে বেশ এক গোছ টিকিট গুঁজে দিয়ে এঁকে বেঁকে যেন লতিয়ে পড়ে আবদার জানালেন, আমার এই পাঁচটা টিকিট, প্লীজ—

আমার পুরোগামিনীই প্রতিবাদ জানালেন, এ তোমার খুব অন্যায় লীনা। আমরা কখন থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি জানো।

লীনা নাম্নী আহ্লাদী একটু হেসে ঠাট্টার সুরে জবাব দিল, পাঁচটা তো মোটে টিকিট। তাতে তোমার পাওনা কমে যাবে না চন্দ্রিকা।

তারপর নিজের টিকিট ভাঙিয়ে লাইন থেকে বেরিয়েই প্যাডকের দিকে ছুটলাম। প্যাডকের চারিধারে তো বটেই সমস্ত টিকিটের জানালা, বুকিদের মহল থেকে সামনের পিছনের মেম্বার্স স্ট্যাণ্ড কিছুই বাদ দিলাম না। কিন্তু রঞ্জা কৌশল আবার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে।

রঞ্জা বা পরাশরকে আর পাওয়া সম্বন্ধে সত্যিই তখন হতাশ হয়ে পড়েছি। ঠিক সেই মুহূর্তেই ডানদিকে চেয়ে বাড়িটার একেবারে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের নিচের তলার ভিড়টা চোখে পড়ল। ওদিক দিয়ে একটা সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি শুধু নয় একটা লিফ্‌টও আছে। ওদিকটা দেখা হয়নি। দ্বিধা না করে সেখানে গিয়েই দাঁড়ালাম।

লিফ্‌ট প্রায় খালিই নামল। প্রচুর জায়গা তার মধ্যে। লাইনের বেশ একটু পিছনে দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত জায়গা পেলাম। লিফ্‌ট প্রথমে গিয়ে থামল দোতলায়, কয়েকজন নেমে যাবার পর লিফ্‌টম্যান আবার দরজা বন্ধ করে লিফ্‌ট ছাড়ল। একেবারে ওপরতলা।

লিফ্‌ট থেকে নেমে সরু করিডর দিয়ে সামনে গেলাম। এখানে

বসবার বেঞ্চির নিচের মত বাহার নেই। অনেকে বোধহয় নিচের চেয়ে নিরিবিলিতে এখানে এসে রেস দেখাই পছন্দ করে। পরাশর যে তাদেরই একজন হতে পারে সে কথা বোধহয় আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল।

সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ডানদিকে বাঁদিকে দুদিকে চেয়ারের গ্যালারি। ডানদিকের ঠিক ওপরের সারির নিচে পরাশর একটি কোণে একটা নোটবই নিয়ে বসে আছে। তারপাশেই বসে আছে রঞ্জা কৌশল। পরাশর নিজের নোটবই-তেই কি লিখতে তন্ময়, রঞ্জা দূরবীণ নিয়ে যে ঘোড়াগুলি স্টার্টিং গেটের দিকে যাচ্ছে তাই লক্ষ্য করছে।

ওদের অজ্ঞাতসারেই একেবারে ওপরের সারিতে কোণে গিয়ে বসলাম। নোটবই-এ কি লিখছে পরাশর, এমন সময়—এ কি! এখানে বসে কবিতা লিখছে। কবিতার প্রথম ক'টা লাইন :

উচ্চৈঃশ্রবা যে চায় সে চাক্
আমার তা নয় শখ আমি চাই চৈতক!

তারপর ক'টা লাইন পড়তে পারলাম না। কিন্তু তার নিচে বড় বড় করে ওটা কি লেখা—

আমি পালাচ্ছি! রঞ্জাকে এখন থেকে চোখের আড়াল কোরো না।
পরাশর আমার লুকিয়ে এসে বসা তাহলে টের পেয়েছে! কিন্তু নির্দেশ যা দিয়েছে তার মানে কি! সেই বা পালাচ্ছে কেন? কোথায়?

আমার তখনকার অবস্থাটা বোঝা নিশ্চয় শক্ত নয়। পরাশরের সঙ্গে এখন কথাবার্তা বলা চলবে না। অচেনা অজানা সেজে পিছনে বসে থেকে শ্রীমতী রঞ্জা কৌশলের ওপর চোখ রাখতে হবে। অনুসরণও করতে হবে আঠার মত লেগে থেকে।

কতক্ষণ? কি ভাবে?

"আমি পালাচ্ছি! রঞ্জাকে চোখের আড়াল কোরো না।" পরাশর তো হুকুম করেই খালাস। কিন্তু কাজটা কি কোন ভদ্রলোকের উপযুক্ত? এরকম একটা বিশ্রী নোংরা দায় অম্লান বদনে আমার ওপর সে চাপাল কি বলে?

রঞ্জা কৌশলকে চোখে চোখে যে রাখব, তা তাকে জানিয়ে শুনিয়ে নিশ্চয় নয়। কিন্তু সেটা কি সম্ভব?

পরাশর না হয় দেখেও না দেখার ভান করে তার রেসের বই-এ মুখ গুঁজে আছে। কিন্তু রঞ্জা এখন দূরবীণ চোখে দিয়ে থাকলেও সেটা নামিয়ে হঠাৎ কি দেখে ফেলতে পারে না?

বসে আছি তো ঠিক তার পিছনেই। একেবারে আমায় লক্ষ্য না করেই এখান থেকে উঠে যাবে এরকম আশা করাই অন্যায়। আর একবার চোখ পড়লে চিনবে না এমন কি হতে পারে! প্রথমটায় তার যদি চিনতে দেরীও হয়, তা হলেও আমার পক্ষে তাকে না চেনার ভান করে বসে থাকা কি ঠিক হবে! সমস্যার কুল-কিনারা পাবার আগেই পরাশর হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে কি একটা ভুলে যাওয়া জরুরী কাজ সেরে আসবার জন্যে উঠে পড়ল।

আরে ছি ছি, কি ভুল হয়ে গেছে। বলে সে উঠে দাঁড়াতেই চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে রঞ্জা জিজ্ঞেস করলে, কি হল কি, পরাশর!

আরে দেখ না, দুপুরেই একজনের সঙ্গে অ্যাপায়েন্টমেন্ট ছিল। রেসের নেশায় বেমালুম ভুলে গেছি। যাই, একবার ফোন করেই আসি।

পরাশর কথা বলতে বলতেই বেরিয়ে চলে গেল। আমার পক্ষে কয়েকটা অত্যন্ত উদ্বেগের মুহূর্ত। রঞ্জা কৌশল চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে এদিকে ওদিকে একটু চাইছে। এখনো পিছনে তাকায়নি এই রক্ষা। কিন্তু সে নিষ্কৃতি আর কতক্ষণ!

এমনিতে যদি বা না তাকায়, খেয়ালভরে এখান থেকে যাবার জন্যে একবার উঠে দাঁড়ালেই তো না দেখে পারবে না। কি বলবে তখন? ওই বীণানিন্দিত কণ্ঠে—এই যে মিঃ ভদ্দর! আপনি এতক্ষণ চুপটি করে বসে আছেন! সাড়া দেননি তো!

এরকম কিছু বলাই স্বভাবিক। আর তাহলেই তো আমার অবস্থা কাহিল। এমন জায়গায় বসেছি যে চুপি চুপি সরে পড়বার জোও নেই। দাঁড়িয়ে উঠে চলে যেতে গেলে চোখে পড়বেই।

কোন উপায় না পেয়ে পরাশরের রেস বইটাই কোলের ওপর ধরে মাথা নিচু করে সেইটে পড়াতেই যেন তন্ময় হবার ভান করলাম। নিচু হয়ে কোলের ওপর প্রায় মুখ গুঁজে থাকার দরুন হয়তো চোখে না-ও পড়তে পারে। এখন শুধু প্রার্থনা রঞ্জা তাড়াতাড়ি এখান থেকে যেন উঠে যায়।

অনির্দিষ্টকাল এমনি মাথা নীচু করে তো থাকতে পারব না। রঞ্জা

তাড়াতাড়ি উঠে গেলে এ শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে নিঃশব্দে তার পিছু নিতে পারি।

আমার প্রার্থনা পূরণ হল ঠিকই। কিন্তু মোট পরিণাম যা হল কল্পনাও করতে পারিনি।

একটু উস্‌খুস করে রঞ্জা হ্যান্ডব্যাগ খুলে তার ফ্যান্সি বায়না-কুলারটা ভরে রেখে সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর সেই মুহূর্তে ঝপ করে কি একটা পড়ে গেল বেঞ্চির নিচে মেঝেয়।

কি পড়েছে তখুনি দেখতে পেলাম। আমার হাতে যেমন আছে তেমনি একটি রেসের বই। মলাটের রঙটা শুধু আলাদা। আমারটা হলদে আর রঞ্জারটা নীল।

চোখে তখন আমি হলদে নীলের সঙ্গে অন্য রংও দেখছি। রেস বুকটা যেন শয়তানি করেই ঠিক আমার আর রঞ্জার বেঞ্চির মাঝখানের ফাঁকটায় পড়েছে। বুঝলাম বইটা রঞ্জার কোলের ওপরই ছিল। খেয়াল না করে ওঠবার সময় সেখান থেকে গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু পড়লেও সামনের দিকে কি পড়তে পারত না!

রঞ্জা আমার দিকে ফিরে আবার বসে পড়ে হাত বাড়িয়ে বইটা তুলতে গেল। রঞ্জার মত মেয়েকে বেঞ্চির পিঠের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে আমারই পায়ের কাছ থেকে তার বইটা তুলতে যেতে দেখে কি কাঠ হয়ে বসে থাকা যায়! পৌরুষ আর ভদ্রতার খাতিরে তা অন্তত পারলাম না। নিজেকেই নিচু হয়ে মেঝে থেকে বইটা তুলে রঞ্জার হাতে দিতে হল।

মধুর একটি হাসি বিতরণ করে রঞ্জা বললে, বহৎ বহৎ সুক্রিয়া—

আমিই তখন এমন ভোম মেরে গেছি যে রঞ্জাকে একটা ভদ্রতার জবাবও দিতে পারলাম না।

ভোম মারবার কারণ? কারণ আশাতীত কল্পনাতীতভাবে একেবারে কেলেঙ্কারির কিনারা থেকে বেঁচে যাওয়া।

নিজের চোখকেই তখন বিশ্বাস করতে পারছি না। আমায় সহাস্য ধন্যবাদটুকু জানিয়ে রঞ্জা কৌশল নির্বিকারভাবে চলে যাচ্ছে।

তার মানে আমাকে সে চিনতে পারেনি। এরকমভাবে বেঁচে যাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচার সঙ্গে যতখানি খুশি হওয়া উচিত তা ঠিক হতে পারলাম কি।

রঞ্জা কৌশলের আমাকে চিনতে না পারাটা সৌভাগ্য হিসেবেও

পৌরুষ অভিমানে কোথায় যেন একটু বিঁধে রইল। এতই আমি রঞ্জার কাছে তুচ্ছ যে আধঘণ্টা আগের পরিচয়ের কোন ছাপই তার মনে নেই।

মনে নাই থাক তাই নিয়ে বসে থাকবার তখন আর সময় নেই। রঞ্জাকে চোখে চোখে রাখতে হবে, পরাশরের এ নির্দেশ অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাড়াতাড়ি উঠে ল্যাণ্ডিং-এর দিকে গেলাম। এখন নামবার আর কেউ নেই। রঞ্জা একলাই লিফ্‌টের বাইরের কোলাপসিব্‌ল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বোতাম টিপছে। ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে লিফ্‌টের জন্যে অপেক্ষা করতে পারি। ওপরের ব্যালান্সিং ওয়েটটা নামার সঙ্গে নিচ থেকে লিফ্‌টটা উঠে আসার ইঙ্গিতও পেলাম। কিন্তু এখন রঞ্জার পাশে গিয়ে তারই একমাত্র সঙ্গী হয়ে লিফ্‌টে নামাটা ভাগ্যকে বড় বেশি চ্যালেঞ্জ করা হবে। পৌরুষ অভিমানে যতই লেগে থাক, আমায় চিনতে না পারার সৌভাগ্যটা এখন বরবাদ হতে দিলে চলবে না। দ্বিধা না করে লিফ্‌টের দিকে না তাকিয়েই সেটাকে বেড় দেওয়া ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি নিচে নামতে শুরু করলাম। নামতে নামতেই লিফ্‌টটা আমার সামনে দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ওপরের ল্যাণ্ডিং-এ সেটা থামা, আর দরজা খুলে বন্ধ হয়ে সেটা আবার নামার আওয়াজও পেলাম। আমি তখন দোতলার কাছে পৌঁছে গেছি। লিফ্‌ট পৌঁছবার আগেই নিচে পৌঁছে যাব নিশ্চয়ই। সেখানে একটু দূরে দাঁড়িয়ে লিফ্‌ট থেকে বার হবার পর রঞ্জাকে অনুসরণ করবার কোন অসুবিধা হবে না।

লিফ্‌টের আগে নিচে পৌঁছলাম ঠিকই। নেমে একটু দূরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নজর রাখলাম লিফ্‌টের নামবার দরজার মুখে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে লিফ্‌টও নামল। কিন্তু এ কি ভোজবাজি!

লিফ্‌টম্যান দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে একজন নয়, বেরিয়ে এল দুজন। তাদের কেউ রঞ্জা কৌশল নয়। দুজনেই আধবয়সী পুরুষ।

কোথায় গেল রঞ্জা কৌশল এরমধ্যে! কোন ভানুমতীর যাদুর কাঠিতে এক থেকে সে দুই হয়ে গেল নাকি? সুন্দরী যুবতী মেয়ে থেকে দুজন প্রৌঢ় পুরুষ! ব্যাখ্যাটা মাথায় আসতে দেরী হল না। সেই সঙ্গে আহম্মকী হিসেবে নিজের ওপর ধিক্কার। দোতলায়

ল্যাণ্ডিং-এর কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম কি বলে! সেখানে একটু অপেক্ষা করলেই তো এমন আহাম্মক হতে হত না।

রঞ্জা কৌশল দোতলাতেই লিফ্‌ট থেকে নেমে গেছে নিশ্চয়ই। প্রৌঢ় ভদ্রলোক দুজন সেখান থেকেই উঠেছেন।

নিজের হাত কামড়াতে তখন শুধু বাকি। সেবারের মত আবার রঞ্জাকে হারাব! আর এত কাণ্ড করে সন্ধান পাওয়ার পর শুধু নিজের বোকামিতে? বারান্দা দিয়ে ছুটে গিয়ে সামনের পশ্চিমের বড় সিঁড়ি দিয়ে হন্ত-দন্ত হয়ে ওপরে উঠলাম। সেখানেও দ্বিধা; বড় সিঁড়ি ডাইনে বাঁয়ে দু'ভাগ হয়ে গেছে ওপরের দিকে। কোন্ দিকে যাব আগে? ডাইনে না বাঁয়ে?

যা থাকে কপালে বলে বাঁয়ের শাখাই বেছে নিলাম। এই দিকেই ওপর থেকে টিকিট কেনবার জানালা আর বার।

নেহাৎ রোগা পাতলা মানুষ তো নই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ওজনটা একটু ভারীরই দিকে। ওপরে যখন পেঁছিলাম তখন বেশ একটু হাঁফাচ্ছি।

সেই অবস্থায় হঠাৎ চমকে থমকে হাত পাগুলো যেন প্রায় অবশ হয়ে এল। চমকাবার কারণ মধুর একটি কণ্ঠস্বর।

এই যে মিঃ ভদ্দর! কাকে খুঁজছেন? আপনার বন্ধু পরাশরকে?
কয়েক সেকেণ্ড প্রায় তোৎলাই হয়ে গেলাম। হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। সামনেই দাঁড়িয়ে রঞ্জা কৌশল; আমায় সম্ভাষণ করছে। তার মুখে মধুর হাসি, কিন্তু গলার স্বরে কি একটু বিদ্রূপ?

তখন তো সামনা সামনি দেখেও চিনতে পারেনি। এখন হঠাৎ চিনল কি করে! শুধু যে চিনেছে তা নয়, মনে হল আমার অপেক্ষাতেই যেন সে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে। যা অপ্রস্তুত হয়েছিলাম! নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিতে বেশ কয়েক সেকেণ্ড লাগল। রঞ্জা নিজে থেকে যে খেইটা ধরিয়ে দিয়েছে সেইটেই ডুবন্ত মানুষের কুটোর মত শেষ পর্যন্ত আঁকড়ে ধরলাম।

হ্যাঁ, আমার বন্ধু, মানে পরাশর কোথায় গেল দেখতেই পাচ্ছি না। আমি আবার একেবারে এখানে নতুন কি না! কথাটা বলতে বলতেই বুঝতে পারলাম যে আমার হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার অজুহাত যা দিচ্ছি তা নেহাৎ খোঁড়া। শুধু খোঁড়াই নয়, একেবারে যে জল-জ্যান্ত মিথ্যে তাও রঞ্জা দেবীর অনায়াসে বোঝবার কথা, খানিক

আগেই পরাশরের পিছনেই যে বসেছিলাম সে কথাটা রঞ্জাদেবী এতক্ষণে কি আর স্মরণ করতে পারেন নি! আমাকে যখন চিনতে পেরেছে তখন সে কথাও মনে পড়েছে নিশ্চয়। রঞ্জার কিন্তু আমার কথার খুঁত ধরার কোন আভাসই দেখা গেল না। অনায়াসে আমার কৈফিয়ৎটা মেনে নিয়ে সহানুভূতির স্বরেই বললে, আপনার বন্ধু নেই বলে জলে তো আর পড়েননি। পরাশর ঠিক সময়েই হাজির হবে। ওকে এখন খুঁজে লাভ নেই। আপনার পুরোন বন্ধু মনে হচ্ছে, সুতরাং ওর স্বভাব আপনার অজানা নয় নিশ্চয়। এ রকম ডুব মেরে বন্ধুবান্ধবকে জব্দ করে ও মজা পায় ; আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

বলে কি রঞ্জা কৌশল! নিরুপায় হয়ে রঞ্জার পিছনে যেতে যেতেই তখন ভাবছি ব্যাপারটা যে সব উল্টো হয়ে গেল! যার পিছনে লুকিয়ে গোয়েন্দাগিরি করব সে-ই তো আমায় ধরে নিয়ে চলেছে। চলেছেই বা কোথায়!

বেশি দূর নয়, সামনের থামটা ঘুরেই ওপরের একটা বক্সের কাছে গিয়ে রঞ্জা থামল। বেশ বড় ছ'সীটের বক্স। কিন্তু খালি তো নয়। চেহারায় পোশাকে ক্ষমতা প্রতিপত্তি পয়সার গরম ফেটে বেরুচ্ছে এমন একটি শেঠমার্কা চেহারা নিজের দেহের মাপসই একটা প্রকান্ড দামী বায়নাকুলার নিয়ে সেখানে সামনের একটি চেয়ারে বসে আছে।

রঞ্জাকে আসতে দেখেই সে মূর্তি টাইট পাম্প করা ফুটবল ব্লাডারের মত মুখ ফিরে তাকিয়েছিল। মুখে চোখে তার চটচটে হাসিমাখানো লুব্ধ প্রত্যাশা। আরে রঞ্জা যে! কি কপাল আমার! মনে হচ্ছে জ্যাকপটই পেয়ে যাব।

পেলে ভাগ দিতে ভুলবেন না যেন!—হেসে বললে রঞ্জা, আপাতত আপনার বক্সের একটু ভাগ চাই বৃজলালজী। আমার আর আমার সঙ্গের এই বন্ধুটির জন্যে।

বৃজলালজীর এতক্ষণে আমার দিকে চোখ পড়ল। মুখের ওপর যে ভ্রূকুটিটা সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সেটা লুকোবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে সরস গলাটা এক মুহূর্তে শুকনো করে ফেলে বললেন, বেশ তো, বোসো না। অভ্যর্থনার ধরন দেখে আমার নিজেরই তখন জুৎসই কিছু বলে অবাঞ্ছিত অতিথির ভূমিকা থেকে সরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার মধ্যেও মাঝে মাঝে কেমন একটা বেয়াড়া জেদ

চাপে। বৃজলালজীর দারুণ অপছন্দ বুঝেই, আরো গোঁ ধরে যেন না বোঝার ভান করে হেসে বাধিত করার ভঙ্গিতে সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

রঞ্জাও সামনের একটা চেয়ারে গিয়ে বসে তখন আমার পরিচয় দিচ্ছে।

ইনি হলেন মিঃ ভদ্দর, আমাদের পরাশর ভর্মার বন্ধু। কলকাতায় ওঁর পেপারের কারবার, আজ প্রথম আমাদের গেস্ট হয়ে রেসকোর্স দেখতে এসেছেন।

পরাশর বর্মার বন্ধু শুনে এক মুহূর্তের জন্যে বৃজলালজীর মুখে যদি বা একটু কৌতূহলের আভাস দেখা দিয়ে থাকে, পরমুহূর্তেই সেটা সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে স্পষ্টই একটা অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল। আমার পরিচয়টা শোনবার ভদ্রতাটুকুও না দেখিয়ে রঞ্জার কথার মাঝখানেই তিনি চোখে দূরবীণ দিয়ে মাঠের দিকেই ফিরে রইলেন।

এ বাজির ঘোড়াগুলো তখন স্টার্টিং গেটে গিয়ে পর পর খুপরি খাঁচায় ঢুকছে। মাইকে সেই ঘোষণাই তখন শুরু হয়েছে। রঞ্জাকে এ বাজিতে কোন ঘোড়া ধরে কিছু খেলতে দেখিনি। আমি যখন পেমেন্ট উইণ্ডোতে আটকে আছি সে সময়ে আগে বেরিয়ে এসে তেতলায় পরাশরের কাছে যাবার মুখে যদি কিছু কিনে এনে থাকে তাহলে আলাদা কথা।

টিকিট কিনুক না কিনুক বাজির সব ঘোড়া নিজের নিজের খাঁচায় ঢোকবার পর রঞ্জার আর কোন কিছুতে হুঁশ রইল না। নিজের দূরবীণ বার করে সেও তখন দৌড়ের ব্যাপারেই তন্ময় হয়ে গেছে।

আমি কিন্তু এবার সামনের রেস সম্বন্ধে উৎসাহিত হতে পারলাম না। জেদ করে বসে থাকলেও বক্সের আসল মালিকের সুস্পষ্ট অবজ্ঞার গ্লানি তো মনে আছেই তার ওপর আমার পরিচয় দিতে রঞ্জা যা বলেছে তাও তখন বেশ একটু ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

রঞ্জা কাগজের কারবারী বলে আমার ভুল পরিচয় দিয়েছে ঠিকই। কাগজের সম্পাদক তার কাছে কারবারী হয়ে উঠেছে, কিন্তু এ ভুল পরিচয়ের মূলটুকু সে পেল কোথায়? তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ব্যাপারটা তো স্পষ্ট মনে আছে। পরাশর কাগজের সম্পাদক-টম্পাদক গোছের কোন কথা তো বলেনি। আমার বন্ধু কৃত্তিবাস ভদ্র, শুধু এটুকুই জানিয়েছিল। কাগজ, তা যে রকমেরই হোক, তার সঙ্গে

আমার সংশ্রবের কথা রঞ্জা জানল কি করে? পরাশর কি তাহলে তাকে সে পরিচয় পরে দিয়েছে?

দেওয়াটা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। আমার সঙ্গে তখন রঞ্জার নেহাৎ পোশাকী ভাসা আলাপই হয়েছিল। সে আলাপের জের টেনে পরস্পর খামোখা আমার পরিচয় দিতে যাবে কেন?

তেতলার গ্যালারিতে রেসবইটা কুড়িয়ে দেবার সময় প্রায় মুখোমুখি দেখেও না চেনবার পর রঞ্জার এখন হঠাৎ আমায় চিনে ফেলার রহস্য-টাই বা কি?

সে রহস্যটার একটা ব্যাখ্যা খানিকবাদেই রঞ্জার কাছেই অবশ্য পাওয়া গেল। বৃজলালজী আমার উপস্থিতিটা যথাসম্ভব অবজ্ঞার সঙ্গে অগ্রাহ্য করেও শেষ পর্যন্ত বোধহয় আর সহ্য করতে পারলেন না। এ দৌড়টা তখন শেষ হয়েছে।

ট্র্যাকের ওপারের বোর্ডে জেতা ঘোড়াদের নাম টাঙাচ্ছে। আমাকে একটু উঠতে হচ্ছে রঞ্জা, কিছু মনে কোর না। বলে আমার দিকে পিছু ফিরেই রঞ্জার কাছে বিদায় নিয়ে মেদিনী কাঁপানো পদভরে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বক্স থেকে করিডরে নেমে অবশ্য তাঁকে থামতে হল। রঞ্জা তখন তাঁর দিকে ফিরে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করছে, কি, পেমেন্ট নিতে যাচ্ছেন বুঝি?

না, একটু ফাঁকায় থাকতে।

যে গলায়, মুখ চোখের যে বিতৃষ্ণার ভঙ্গির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে বৃজলালজী চলে গেলেন তাতে তাঁর হঠাৎ ফাঁকায় যেতে চাওয়ার কারণটা বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট রইল না। ব্যাপারটা আমি বেয়াড়া জেদেই অগ্রাহ্য করলেও রঞ্জার পক্ষে তা বুঝতে না পারা একটু আশ্চর্য!

বৃজলাল চলে যাবার পর রঞ্জা কিন্তু নিতান্ত সহজ স্বাভাবিক-ভাবেই হেসে অনুরোধ জানালে, পিছনে কেন! সামনে এসে বসুন না!

সামনে যাওয়া মানে বৃজলালজীর চেয়ারটিই গিয়ে দখল করা। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, বৃজলালজীর চেয়ারটাই দখল করব? উনি আসবেন?

এলে পিছনে বসবেন! অম্লান বদনে জানালে রঞ্জা, তাছাড়া উনি আর ফিরে বোধহয় আসবেন না।

তার মানে,—সামনের চেয়ারে উঠে গিয়ে বসতে বসতে বললাম, মালিককেই তাঁর বক্স থেকে তাড়ালাম।

মালিক! রঞ্জা কৌশলের মুখে বিস্ময় মেশানো কৌতুকের হাসি, বৃজলালজী আবার কিসের মালিক? এই বক্সের? না না, নিজের খরচে বক্স নিয়ে পাঁচজনের সুবিধে করবার মত বুদ্ধু বৃজলালজী নয়। বক্সের লটারীতে ও নামই পাঠায় না। এ বক্স আমাদের এক পরিচিত বন্ধুর। বৃজলালজী তারই দৌলতে এখানে বসেন।

কিন্তু আপনি প্রথমে ওঁর কাছেই যেন অনুমতি চাইলেন এখানে বসবার জন্যে, নিজের সংশয়টুকু প্রকাশ না করে পারলাম না।

সে শুধু বৃজলালজীকে একটু খোঁচা দেবার জন্যে। লোকটার টাকার পাহাড় যত উঁচু, মনটা তত নিচু আর ছোট। কিন্তু ওর কথা যাক্। ঘৃণাতেই একটু মুখ বেঁকিয়ে রঞ্জা তারপর হঠাৎ বললে, আপনি একটা ব্যাপারে নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছেন?

কি ব্যাপারে বলুন তো? সত্যিই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

আপনাকে তখন চিনতে পারিনি বলে!

কোথায় কখন বলে না বোঝার ভান করে অকারণে কথা বাড়াতে ইচ্ছে করল না। সোজাসুজিই ভদ্রতা করে বললাম, সেটা অবাক হবার মত কিছু তো নয়। আপনি আর কতটুকুই বা আমায় দেখেছেন!

না না, যা দেখেছি তাতেই মনে থাকা উচিত ছিল, রঞ্জা কৈফিয়ত দিতে ব্যস্ত হল, শুধু তখন একটু অন্যমনস্ক ছিলাম বোধহয়। তারপর আপনাকে লিফ্‌ট ছেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে দেখেই হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। তখন আর আপনাকে কোথায় পাই। তবু দেখা হয়ে গেলে মাফ চাইব ভেবে রাখলাম। খানিকবাদেই যে এমনভাবে দেখা হয়ে যাবে তা অবশ্য তখন ভাবিনি।

এতখানি দীর্ঘ কৈফিয়ত দেওয়াটা বেশ একটু অস্বাভাবিক লাগল। তার কথা শুনতে শুনতে একটু আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করছিলাম। পোশাকে চালচলনে অতি আধুনিক হলেও যে রকম সহজ সরল মনে হচ্ছে তাকে—সেটা কি তার যথার্থ পরিচয়! পরাশরের বেছে বেছে এই মেয়েটির ওপরই নজর রাখতে বলার কারণটা আসলে কি?

এতক্ষণ পর্যন্ত তাকে যেটুকু দেখেছি তার মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করবার মত কিছুই তো পাইনি। ঘোড় দৌড় সম্বন্ধেও যে খুব

উৎসাহী তাও মনে হচ্ছে না। নেহাত আলাপটা চালু রাখবার জন্যে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম, কই, আপনি কিছু খেলছেন না এ বাজিতে! আমার জন্যেই আটকে আছেন না কি!

না না, রঞ্জা হেসে প্রতিবাদ জানালে, আপনার জন্যে আটকে থাকব কেন! ওই তো উইণ্ডো। উঠে গিয়ে টিকিট কিনলেই হয়। কিন্তু এ সব বাজে বাজিতে আমি পারতপক্ষে কিছু খেলি না। সব একেবারে বি-টু ঘোড়া কিনা।

বি-টু ঘোড়া মানে? আমার অজ্ঞতাটা প্রকাশ না করে পারলাম না।

বি-টু মানে বি-ক্লাশের ও তলার। রঞ্জা বুঝিয়ে দিলে, এখানে যে সব ঘোড়া দৌড়াচ্ছে তার মধ্যে সব চেয়ে ওঁচা-রদ্দি-মার্কা ঘোড়া। এ সব ঘোড়ার দৌড়ের কোন মাথামুণ্ডু নেই। ওই দেখুন না, কোথা থেকে কোন্ একটা ভীমরাজ ঘোড়া একেবারে হট্ ফেভারিট হয়ে উঠেছে। একেবারে ফোর ফিফ্থ্-এর দর।

কত দর, আর কোন্ ঘোড়া ফেভারিট, তা এখানে বসে কি করে জানলেন! আবার আমার অজ্ঞতাটা লজ্জার মাথা খেয়ে জানাতে হল।

সহানুভূতির সঙ্গে হেসে রঞ্জা কৌশল নিচের ট্র্যাক-এর ওপারের একটা চৌকো বোর্ড দেখিয়ে বললে, ওই বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছেন? ওটা হল বুক-এ নানা ঘোড়ার যখন যে দর উঠছে নামছে হদিশ দেবার জন্য রাখা। বাঁয়ে পর পর সব ঘোড়ার নম্বর দেওয়া আছে, আর ডাইনে তাদের দর। দেখুন সবার ওপরে চার নম্বর আর তার ডান পাশে রয়েছে ফাইভ্ টু ফোর অন। মানে হল চার নম্বর ঘোড়া ভীমরাজ জিতবে বলে বাজি ধরলে এখন দর পাবেন পাঁচ টাকার চারটাকা মাত্র। তার ওপর আছে শতকরা সাড়ে সতেরো টাকা ট্যাক্স।

ব্যাপারটা বুঝে এবার জিজ্ঞাসা করলাম, ভীমরাজ তাহলে জিতবেই বলে সবাই ধরে নিয়েছে বুঝি? খুব ভাল ঘোড়া?

ভাল! রঞ্জা তাচ্ছিল্যভরে হেসে উঠল, একে বি-টু তার ওপর বাপ-মা'র পরিচয়হীন নেহাত হাঘরে ঘোড়া। ঘোড়াটা আমার তো অজানা নয়। আমাদের চৌহানই বছরখানেক হল কিনেছে।

কিন্তু হঠাৎ ও ঘোড়ার ওপর লোকের এক টান হল কেন!

সেইটেই তো বুঝতে পারছি না। রঞ্জা মুখ বেঁকিয়ে বললে, আপনার রেসের বই-এর পিছনে ইনডেক্স দেখুন না, ঘোড়াটার বাপ-মা'র পরিচয় লেখা আছে, আননোন—আননোন! তার মানে না বাপ

না মা কারুর পরিচয় জানা নেই। সেই ঘোড়া হঠাৎ অড্‌স অন্‌ ফেভারিট হয়ে উঠেছে নেহাত বি-টু ক্লাসের দৌড় বলেই।

এরপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে রঞ্জা বললে, এ রেস যখন খেলছিই না তখন আসুন, একটু গলা ভিজিয়ে আসি।

গলা ভিজিয়ে আসার মানেটা ঠিক না বুঝলেও সত্যিই সংকুচিত হয়ে একটু আপত্তি জানাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রঞ্জার কাছে তা টিকল না।

আসুন, আসুন। ড্রিংক না করেন, একটা কোলা তো খেতে পারেন। আপনি পরাশরের বন্ধু, আপনাকে এটুকু খাতির অন্তত করতে দিন। বলে রঞ্জা ডানদিকের বারে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল।

নিজে সে তখন বারের কাউন্টারে হেলান দিয়ে হ্যান্ড ব্যাগ থেকে পাউডার প্যাড বার করে নাকে মুখে আলতোভাবে চাপড়াতে চাপড়াতে তারই মত জন দুই রেস বিলাসিনীর সঙ্গে আলাপ করছে।

সত্যি কথা বলতে গেলে এই রেসে আসার ব্যাপারটা এবার রীতিমত খারাপ লাগছিল। রঞ্জা কৌশল নিজে থেকে ল্যাংবোট করায় তাকে নজরে রাখার একদিক দিয়ে সুবিধে হয়েছে ঠিকই। কিন্তু নজর রেখে লাভটা কি সেইটেই তখন বুঝতে পারছি না। মনে মনে এই নীরস একঘেয়েমি আমার ওপর চাপাবার জন্যে পরাশরের যখন মুণ্ডপাত করছি ঠিক সেই মুহূর্তেই ব্যাপারটা ঘটল। একটা ব্যাপার নয়, পর পর যেন ঘটনার ঝড়।

এতক্ষণ ধরে যেমন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম সবকিছুর একঘেয়েমিতে, হঠাৎ তেমনি একেবারে হাঁফিয়ে দিশাহারা হয়ে যেতে হল পর পর অপ্রত্যাশিত সব উত্তেজনার ঢেউয়ে।

একটা কোক্‌ নিয়ে সবে তখন স্ট্রটা মুখে দিয়ে টান দিতে যাচ্ছি হঠাৎ প্রথম মাইকের ঘোষণাটা শুনতে পেলাম। সে ঘোষণায় আমি অন্তত প্রথমে বিচলিত হবার কিছু পাইনি।

মাইকে তখন ঘোষণা করছে যে, মালিকের বিশেষ অনুরোধে এবং কোর্সের ডাক্তারের পরামর্শমত স্টুয়ার্ডদের অনুমতিতে ভীমরাজ ঘোড়াটি এ বাজি থেকে কাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ব্যাপারটা যে বেশ অস্বাভাবিক কিছু বারের কাছে যে ক'জন ছিল, তাদের হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠার ধরন থেকেই একটু আঁচ করতে পারলাম। রঞ্জা কৌশলের প্রতিক্রিয়াতে আরো। রঞ্জা নিজে কিছু

খেলেনি। কিন্তু ভীমরাজ ঘোড়া শেষ মুহূর্তে মালিকের বিশেষ অনুরোধে কাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে শুনে বিস্ময়ে সন্দেহে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল।

ভীমরাজ উইথড্র করে নেওয়া হচ্ছে কি! ভীমরাজের মালিক তো চৌহান, সে কোথায়?—রঞ্জা বেশ অস্থির হয়ে তখন চারিদিকে তাকাচ্ছে।

হ্যাঁ, কোথায় ভীমরাজের মালিক!

ভারী গলায় প্রায় হিংস্র হুঙ্কার শুনে ফিরে চেয়ে দেখি আমার সংগটাও খানিক আগে যাঁর অসহ্য হয়ে উঠেছিল সেই বৃজলালজীই বুনো মোষের মত রাগে উত্তেজনায় প্রায় ফেটে যাবার মত চেহারায় এগিয়ে আসছেন।

আমাকে এবার তিনি দেখতেই পেলেন না। রঞ্জার সামনে এসে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকেই যেন অভিযুক্ত করে চড়া গলায় জানতে চাইলেন, কই, কোথায় ভীমরাজের মালিক! সে তো আজ কোর্সেই আসেনি। ঘোড়া উইথড্র করছে তাহলে কে?

আজ্ঞে আমি!

আর একবার চমকাবার পালা। গলাটা শুনে যা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, পিছনে ফেরে তাকিয়ে তাই সত্য বলে জানলাম।

গলাটা পরাশরের। কখন যে সে নিঃশব্দে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা টেরই পাইনি।

আমি শুধু বিস্মিতই হয়েছিলাম, আর বৃজলালজী প্রায় ক্ষেপে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত গলায় বললেন, আপনি? আপনার ঘোড়া কাটাবার কি এক্তিয়ার? ঘোড়ার মালিক চৌহান, আর সে আজ মাঠেই আসেনি এ পর্যন্ত।

তিনি না আসতে পারেন—পরাশরের গলা যেন মাখন মাখানো, কিন্তু আমি তো এসেছি।

আপনি এসেছেন তো কি হয়েছে, বৃজলালজী এবারে প্রায় মারমুখো। বারের কাছে যে ভিড় তখন জমে গেছে তার মধ্যে অনেককেই দেখলাম বৃজলালজীরই সমর্থক।

পরাশর তবু নির্বিকার। বার থেকে আমারই মত একটি কোকা-কোলা নিয়ে স্ট্রতে টান দিতে দিতে বললে, যা হয়েছে তা তো জানতেই পেরেছেন। ভীমরাজকে এ রেস থেকে কাটিয়ে নেওয়া

হয়েছে। স্টাটার-এর অর্ডারে আসবার আগেই যখন কাটানো হয়েছে তখন বাজি যা ধরেছেন তার কিছু অবশ্য ফেরত পাবেন। তবে অড্‌স্ অন্ ফেভারিট ছিল বুকে, যদি ধরে থাকেন তাহলে টাকায় পঞ্চাশ পয়সাই কাটা যাবে। খুব বেশি লোভ করেছিলেন নাকি?

স্যাট্ আপ্—একেবারে সত্যিই যেন ফেটে পড়লেন বৃজলালজী, যা-ই ধরে থাকি, দ্যাট্‌স নন্ অফ্ ইওর বিজ্‌নেস। আমি যাচ্ছি স্টুয়ার্ডদের কাছে। মালিক উপস্থিত নেই, তবু তার অনুরোধে কি করে ঘোড়া শেষ মুহূর্তে উইথড্রন হল জানতে চাই।

বৃজলালজীর সঙ্গে আরো অনেককেই এ অভিযানে যেতে প্রস্তুত দেখা গেল।

কিন্তু যাওয়া তাঁদের হল না। তাঁরা যাবার উপক্রম করতেই আগের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বেশে একটু কঠিন গলায় পরাশর তাঁদের সাবধান করলে, মিছিমিছি কেলেঙ্কারী করতে চান তো করুন। কিন্তু তার আগে আমার কথাটা একটু বিশ্বাস করলে ভাল করতেন।

কিসে বিশ্বাস করব আপনাকে!—বৃজলালজী নয়, তাঁরই সমর্থকের একজন জ্বলন্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলে।

বিশ্বাস করবেন আমি ভীমরাজের মালিক বলে!—পরাশর ধীরে ধীরে প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, কাল রাত্রেই চৌহানের এ ঘোড়া আমি কিনেছি।

কাল কিনেছেন? আপনি? চৌহান এ ঘোড়া আপনাকে বিক্রি করল? আর মালিক হয়েই আপনি জিতের মুখে ঘোড়াটা কাটিয়ে নিয়ে আমাদের সর্বনাশ করলেন! একা বৃজলালজী নয়, সমবেতদের ভিন্ন ভিন্ন ক্রুদ্ধ ও কাতর মন্তব্য।

পরাশর শুধু শেষ মন্তব্যটারই জবাব দিলে একটু হেসে, সর্বনাশ করেছি কি, অর্ধেক অন্তত বাঁচিয়ে দিয়েছি, আশা করি পরে বুঝবেন। আচ্ছা নমস্তে।

আমায় চোখের ইঙ্গিতে ডেকে পরাশর সামনের সিঁড়ি দিয়ে নামতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ পিছনে অস্ফুট আর্তনাদে তাকে থামতে হল।

আমার ব্যাগ! আর্তনাদটা আর কারুর নয়, রঞ্জা কৌশলের। ফিরে দাঁড়িয়ে প্রায় এক লাফে রঞ্জার কাছে এসে পরাশর বেশ একটু

তীক্ষ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে তোমার ব্যাগের? ব্যাগ তো তোমার হাতে!

সত্যিই রঞ্জা হাতে একটা ব্যাগ নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। ব্যাগটা ঠিক সাধারণ নয়, আর এ পর্যন্ত তার হাতে এই ব্যাগই দেখেছি বলে মনে পড়ল। রঞ্জার মুখে কিন্তু তখন কে যেন ছাই মেড়ে দিয়েছে।

পরাশরের কথার উত্তরে প্রায় অস্ফুট ভীত কণ্ঠে সে বললে, এ ব্যাগ আমার নয়, কে বদলে নিয়েছে—

বদলে নিয়েছে!—উপস্থিতদের একজন প্রশ্ন করলে, নেবার কারণ কি? টাকা ছিল অনেক?

না না, টাকা ছিল না বেশি! কিন্তু—রঞ্জা ভয়ে দিশাহারা হয়েই যেন আর কিছু বলতে পারলে না।

কিন্তু কি? অন্য দামী জিনিস ছিল কিছু? গয়না-পত্র? দলিল-টলিল?

অনেকের অনেক প্রশ্নের ভেতর থেকে একরকম জোর করেই রঞ্জার ব্যাগটা নিজের হাতে নিয়ে পরাশর প্রায় আদেশের সুরে বললে, এস আমার সঙ্গে।

উপস্থিতদের মধ্যে কে যেন প্রতিবাদ জানাতে গেল। কিন্তু তখন রেস শুরু হওয়ার ঘণ্টা দিয়েছে। কোন একজন মহিলার হ্যাণ্ড-ব্যাগ বদল হওয়ার রহস্যের চেয়ে যে দৌড়ের আকর্ষণ অনেক বেশি। বিনা বাধাতেই পরাশর রঞ্জা ও আমাকে নিয়ে নিচে নেমে গেল। কিন্তু নিচে নেমে পরাশর চলেছে কোথায়? কোর্স থেকে তো বেরিয়েই যাচ্ছে দেখছি।

এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে পরাশর সত্যিই একেবারে বাইরের হাতায় চৌহানের গাড়ির কাছে গিয়ে হাজির। ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার যেন অপেক্ষা করেই ছিল। আমরা গিয়ে পৌঁছতেই সেলাম করে দরজা খুলে ধরলে। প্রথমে রঞ্জা ও তারপর তারই মত হতভম্ব আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিজে উঠে পরাশর হুকুম দিলে, চল সাহেবকা কোঠি—

জো হুকুম। বলে দরজা বন্ধ করে ড্রাইভার তার সীটে গিয়ে বসে গাড়ি ছেড়ে দেবার পর বিমূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, সাহেবের কোঠি মানে, কোথায় যাচ্ছি আমরা? মিঃ চৌহানের বাড়ি?

তাছাড়া আবার কোথায়? পরাশরের সংক্ষিপ্ত জবাব।

কিন্তু চৌহানের বাড়ি কেন? এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়ে রঞ্জা প্রশ্ন করলে।

কেন? পরাশর রঞ্জার দিকে ফিরে একটু অদ্ভুতভাবে চেয়ে বললে, শুনলে অবাক হবে কিনা জানি না, কিন্তু চৌহানকে আজ দুপুরে বারোটা নাগাদ কে যেন গুলি করেছে!

গুলি করেছে? চৌহানকে? রঞ্জার স্তম্ভিত গলার মধ্যেই কথাগুলো যেন আটকে গেল। আমার অবস্থাও প্রায় তাই। হ্যাঁ, বেলা বারোটা নাগাদ। পরাশর যেন মেপে মেপে বললে, তুমি তো তখন চৌহানের কাছে গিয়েছিলে?

আমি! আমি......রঞ্জার মুখ দিয়ে আর কিছু বার হল না। হ্যাঁ, অস্বীকার করবার চেষ্টা কোরো না—পরাশরের গলা যেমন শান্ত তেমনি দৃঢ়, তুমি গিয়েছিলে, তার সাক্ষী আছে ওখানে।

কিন্তু আমি তো......রঞ্জা এবারও কথা শেষ করতে পারল না। পরাশরই তার হয়ে কথাটা পূরণ করে বললে, তুমি গুলি করনি বলতে চাইছ। কিন্তু যে ব্যাগ তোমার বদলি হয়েছে বলছ, সেই ব্যাগের ভেতরেই তোমার বিরুদ্ধে চাক্ষুষ প্রমাণ আছে বলে আমার বিশ্বাস। তোমার অনুমতি না নিয়েই তাই ব্যাগটা খুলছি।

পরাশর সত্যি সত্যিই এবার ব্যাগটা খুলে ফেলল। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে তাই দিয়ে সন্তর্পণে ধরে যে জিনিসটি বার করে আনল সেটি সত্যিই একটি ছোট বাহারি পিস্তল। মেয়েদের হাতেই যা মানায়।

আমি হতভম্ব, আর রঞ্জার মুখে এমন একটা ভীত করুণ অসহায় ভাব যা অভিনয় হলে অতুলনীয়ই বলতে হয়।

অনেক কষ্টে নিজেকে যেন সামলে রঞ্জা বললে, কিন্তু ও পিস্তল আমার নয়। কখনো ওরকম কোন পিস্তল আমার ছিল না।

কিন্তু এ পিস্তলে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া যেতে পারে, তা যদি তোমার হয়? পরাশর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রঞ্জার দিকে।

যদি আমার হয়! হতাশভাবে বললে রঞ্জা, কিন্তু আমার আঙুলের ছাপ তো থাকতেই পারে। প্রথমে না জেনে আমি ব্যাগ হাঁটকাবার সময় পিস্তলটা তো ধরে ফেলি। আর তাইতেই হঠাৎ ভয় পেয়ে 'আমার ব্যাগ' বলে চিৎকার করে উঠি!

রুমাল দিয়ে ধরা পিস্তলটা আমার ব্যাগের ভেতর রেখে পরাশর একটু যেন নির্মমভাবেই এবার বললে, আশা করি তোমার কৈফিয়ত সত্য বলে প্রমাণ হবে!

তুমি, তুমি কি আমায় বিশ্বাস কর না পরাশর? কাতরভাবে পরাশরের কাছেই যেন শেষ আশ্রয় চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে রঞ্জা।

আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন এটা নয় রঞ্জা! পরাশর নির্লিপ্ত-ভাবে বললে, আচ্ছা, একটা কথা সত্য করে আমায় বলবে?

নিশ্চয় বলব। এতটুকু মিথ্যা বলব না! আকুল হয়ে বললে রঞ্জা, বল কি তোমার প্রশ্ন?

চৌহানের কাছে তুমি গিয়েছিলে সে কথা তো অস্বীকার করছ না। পরাশর বললে, কিন্তু সেখানে গিয়েও চৌহানকে না নিয়ে একলা মাঠে এলে কেন?

কেন এলাম! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যেন নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বললে রঞ্জা, একলা চলে এলাম রাগে আর অভিমানে। চৌহান ঘরে থেকেও আমার সঙ্গে দেখা করেনি।

ঘরে থেকেও তোমার সঙ্গে দেখা করেনি! পরাশরের গলায় স্পষ্ট সন্দেহের সুর, চৌহানের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আমার একেবারে অজানা নয় রঞ্জা।

যা জানো তা তো আমি অস্বীকার করছি না। এবার প্রায় শান্ত স্বরে বললে রঞ্জা, কিন্তু জানো না এমন কিছুও আছে। ক'দিন ধরে যে কোন কারণে হোক আমাদের একটু মন-কষাকষি যাচ্ছিল। আমি আজ সেটা শেষ করে দেবার জন্যেই চৌহানের কাছে ফোনে কিছু না জানিয়েই গিয়েছিলাম। ইচ্ছে করে প্রথমে ওর ঘরে যাইনি। ওর বেয়ারাকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে বসবার ঘরেই অপেক্ষা করছিলাম। বেয়ারা যাবার পর অনেকক্ষণ বাদেও চৌহান না আসায় ভেবেছিলাম চৌহান বুঝি বাড়িতে নেই। এবার তার ঘরেই কিছু একটু চিহ্ন আর চিঠি রেখে যাব বলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হলের ভেতর দিয়ে যাবার সময়েই চৌহান ঘরে আছে প্রমাণ পেয়ে তখনই ফিরে চলে আসি। ঘরে থেকেও চৌহান আমায় বসবার ঘরে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে—এ অপমান তখন আমার অসহ্য লেগেছে।

চৌহানকে ঘরে থাকতে তাহলে তুমি দেখেছ? কি যেন ভাবতে

ভাবতে জিজ্ঞাসা করলে পরাশর, সেও তাহলে তোমায় দেখেছে?

না. সে দেখতে পায়নি। বললে রঞ্জা, ঘরের কাঁচের সার্সি বন্ধ ছিল। আমি তার পিছনে ওর ছায়া দেখেই বুঝেছিলাম যে ও ঘরে আছে। ও আমায় দেখতে পায়নি।

কিন্তু পরাশরের মুখে একটু অদ্ভুত হাসি যেন ফুটে উঠল, ওই বন্ধ কাঁচের জানলা দিয়েই চৌহানকে গুলি করা হয়েছে। আর গুলি যা পাওয়া গেছে তা তোমার আঙুলের ছাপ লাগা ওই পিস্তলের সঙ্গেই মিলবে বলে আমার বিশ্বাস।

কিন্তু চৌহানকে আমি গুলি করতে যাব কেন? এতক্ষণের অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা সংযমের বাঁধ ভেঙে গিয়ে প্রায় আর্তনাদের সুরে বললে রঞ্জা, চৌহান কি আমার শত্রু! চৌহানকে আর কেউই বা গুলি করতে যাবে কেন?

কেন তা জানো না? পরাশর যেন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললে, গুলি করেছে ওই ভীমরাজের জন্যে।

ভীমরাজ মানে ওই ঘোড়াটার জন্যে! এবার আমিই সবিস্ময়ে বললাম।

হ্যাঁ, ওই ঘোড়াটাকে নিয়ে একটা মস্ত বড় র‍্যাকেট-এর তোড়জোড় অনেকদিন ধরেই চলছিল, পরাশর ব্যাখ্যা করে বোঝালে, ওই ঘোড়াটাকে কাজে লাগিয়ে বিরাট একটা দাঁও মারবার ষড়যন্ত্র। চৌহান মাঠে-টাটে যায় কিন্তু জাত জুয়াড়ি যাকে বলে তা ও নয়। ঘোড়া-টোড়া কেনার কোন বাতিক ওর ছিল না। বন্ধু বান্ধবের কথায় আর হঠাৎ চোখে লেগে যাওয়ার দরুণ অতি সামান্য দামে দিল্লীতে একটা বাচ্চা ঘোড়া একদিন কিনে ফেলে। ঘোড়াটার কোন কুলে পরিচয় দেবার মত কিছু নেই, কিন্তু চেহারাটার একটু চটক আছে। দিল্লী থেকে কিনে চৌহান ঘোড়াটাকে এখানকার এক ট্রেনারের জিম্মায় দিয়ে তার কথা প্রায় ভুলেই গেছিল। চৌহানের ট্রেনারই একদিন এসে তাকে হুঁশিয়ার করবার চেষ্টা করে। বলে যে, ভীমরাজ ঘোড়াটা নিয়ে কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার হচ্ছে বলে তার সন্দেহ হয়। তার স্টেব্‌লের সহিস বেয়ারাদের কে তার ভেতর আছে এখনও ধরতে পারছে না বলে সে চুপ করে আছে।

কিন্তু চৌহান যেন ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য না করে, ট্রেনার তো সজাগ থাকবেই, চৌহানও যেন তার দিক দিয়ে এ ব্যাপারের একটু হদিশ

পাবার চেষ্টা করে।

হদিশ যা পাওয়া যায় তা সাংঘাতিক শয়তানির। আজকের রেসেই সে শয়তানি চূড়ান্তভাবে সফল করবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

কিসের ব্যবস্থা হয়েছিল? রঞ্জাই জিজ্ঞাসা করলে উৎসুকভাবে, ভীমরাজকে দিয়ে বাজি মারার? আজ ভীমরাজ ও রেসে দৌড়লে জিতত?

হ্যাঁ, জিতত নিশ্চিত। গম্ভীর হয়ে বললে পরাশর, কিন্তু চক্রান্তটা তাকে জিতিয়ে দাঁও মারবার মত অত সরল সোজা নয়। অনেক বেশি গভীর। ভীমরাজ তো দেখেছ আজ 'অড্স্ অন ফেভারিট্' হয়ে গেছিল। তার দর যা নেমে গেছল তাতে ভীমরাজের ওপর দিয়ে কত টাকা আর তোলা যেত? তাই ষড়যন্ত্রটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। ভীমরাজকে রাখা হয়েছিল শুধু সকলের চোখে ধুলো দেবার জন্যে।

কিন্তু ভীমরাজ যে জিতত তা তো তুমি নিজেই বলছ। আমি আমার সংশয়টা প্রকাশ করলাম, জিতলে আর চোখে ধুলো বলছ কেন?

বলছি, জেতাটা সত্যিই চোখে ধুলো ছাড়া আর কিছু নয় বলে। পরাশর তিক্তভাবে হাসল, ভীমরাজ জিতত ঠিকই, কিন্তু তার পরেই অবজেক্শনের সঙ্কেত-সাইরেন বাজত। এবং সে সাইরেনের পর লাল নয়—নীল চোঙা উঠত মাঠে।

নীল চোঙা! রঞ্জা বিস্মিত স্বরে বললে, লাল আর সাদা 'কোন'-ই তো জানি, নীল চোঙা আবার আছে নাকি?

আছে। জানালে পরাশর, আঠারো নম্বর বিধান ধরে স্টুয়ার্ডরা যদি ঘোড়ার দৌড় সম্বন্ধে তখুনি তদন্তের ব্যবস্থা করে তাহলে নীল চোঙা ওঠে। তদন্তে দোষ প্রমাণ হলে নীল চোঙার সঙ্গে সাদা চোঙাও তোলা হয়। ভীমরাজের বেলা তাই তোলা হত।

কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

কারণ ভীমরাজের মুখের ফেনাতে নিষিদ্ধ ওষুধের এমন নির্ভুল স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যেত যে তার জন্যে লম্বা ল্যাবরেটরি টেস্টের দরকার থাকত না।

কিন্তু জেতা ঘোড়াকে অমন ভাবে হারিয়ে লাভ? আবার প্রশ্ন করলাম।

লাভ তার পরে চড়াদরের যে ঘোড়া দ্বিতীয় হবে, সফল নালিশে ভীমরাজ বাতিল হওয়ার দরুন তার প্রথম হয়ে যাওয়া। পরাশর বোঝালে, বাজারে উড়ো খবর রটিয়ে ভীমরাজকে ফেভারিট করার পিছনে ওই প্যাঁচই ছিল। সাধারণকে একটু পথ দেখিয়ে ভীমরাজের জন্যে পাগল করে তুলে আসল টাকা গিয়ে পড়েছে অন্য এক ঘোড়ার ওপর। আমি মালিক হয়ে গিয়ে ভীমরাজকে না কাটিয়ে নিলে সেই ঘোড়াই এতক্ষণে প্রথম বলে ঘোষণা পেয়ে কিছু শয়তানকে বড়লোক করে দিত।

একটু থেমে কথাগুলোয় যেন দাগ দিয়ে পরাশর আবার বললে, চৌহানকে মারবার কারণ এই, যাতে শেষ মুহূর্তে এ ঘোড়ার দৌড় সম্বন্ধে সে কোন বাধা না দিতে পারে। তাছাড়া এ খুনটা ভীম-রাজকে অন্যায়ভাবে জেতানোর সঙ্গেই জড়ানো মনে হবে, তার পরের ঘোড়াটার শেষ পর্যন্ত যেন পাকে চক্রে উইনার হওয়ার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্বন্ধ কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারবে না।

আমি এরকম ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকতে পারি তুমি ভাবতে পারছ?—রঞ্জার কণ্ঠে এবার শুধু বেদনা নয় তার সঙ্গে তীব্র ক্ষোভও মেশানো।

ভাবা খুব কঠিন, পরাশর স্বীকার করলে। কিন্তু তারপর যেন দ্বিগুণ জোর দিয়ে বললে, তবে এ ষড়যন্ত্র যারা করেছে তারা অচেনা অজানা বাইরের কেউ নয়। চৌহানের সঙ্গে যারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এমনি অন্তরঙ্গ মহলেরই লোক। সুতরাং তোমাকে একেবারে বাদ দিই কি করে বল! বিশেষ করে যখন জানা যাচ্ছে যে তুমি ঠিক ওই সময়টিতেই চৌহানের কাছে গিয়েছিলে, আর তোমার ব্যাগেই এমন একটা পিস্তল পাওয়া যাচ্ছে যেটা থেকেই চৌহানকে গুলি করা হয়েছে বলে হয়তো প্রমাণ মিলবে।

আর কিছু না বলে রঞ্জা নিজের উদ্গত কান্না চাপবার জন্যেই বোধ হয় দু'হাতে মুখ ঢাকল, আর পরাশর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তীব্র অভিযোগের সুরে বললে, কিন্তু তোমায় তো রঞ্জার ওপর সমানে নজর রাখতে বলেছিলাম। তাও পারনি।

আমি, আমি, মানে,—প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে তারপর রেগে উঠেই বললাম, কে বললে নজর রাখিনি! তোমার নির্দেশ পাওয়ার পর লিফ্‌ট থেকে নামবার সময়টুকু ছাড়া আগাগোড়া চোখে রেখেছি।

তার জন্যে কষ্ট করতেও হয়নি। রঞ্জা দেবী নিজেই আমায় চিনে নিয়ে সংগী করেছেন।

হুঁ! পরাশরের মুখে যেন বিদ্রূপের আভাস, তা সংগী হয়ে লক্ষ্যটা কি করেছ!

লক্ষ্য করবার কিছু থাকলে তো করব! আমি ক্ষুণ্ণ স্বরেই জবাব দিলাম, উনি খানিকক্ষণ আমায় নিয়ে একটা বক্সে বসেছিলেন। তারপর উঠে বারে গিয়ে দুটো সফ্‌ট ড্রিংক অর্ডার দেবার পরই ভীমরাজের নাম কাটাবার ঘোষণা আর আনুষঙ্গিক সব ব্যাপার শুরু। তুমি তো তখন সেখানে হাজিরই হয়েছ!

শেষ কথাটা তাকে একটু খোঁচা দেবার জন্যেই বলেছিলাম।

কিন্তু পরাশর সেটা হয় টের না পেয়ে অথবা গ্রাহ্য না করে আগের মতই একটু বিদ্রূপের সুরে বললে, যতক্ষণ সঙ্গে ছিলে তার মধ্যে তুমি লক্ষ্য করবার মত কিছুই পাওনি? তোমার সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গে রঞ্জার দেখা হয়নি, কারুর সঙ্গে সে কথা বলেনি......?

কথা বলবেন না কেন, পরাশরকে বাধা দিয়ে বললাম, প্রথমে যে বক্সে নিয়ে গিয়ে আমায় বসান সেখানেই তো একজন ছিল।

কে? পরাশরের গলা একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল আগ্রহে। ওই ভীমরাজ কাটিয়ে নেওয়া নিয়ে বার-এ তোমার ওপর যিনি খাপ্পা হয়েছিলেন সেই বৃজলালজী। তিনি অবশ্য খানিক বাদেই আমাকে সহ্য করতে না পেরে উঠে চলে যান বক্স থেকে।

বৃজলালজী! পরাশর কয়েক সেকেণ্ড কি যেন ভেবে নিয়ে বললে, বৃজলালজী তাহলে বক্সে ছিলেন?

কিন্তু,—সত্যের খাতিরে আমায় বলতে হল, রঞ্জা দেবীর ব্যাগ বদলের কোন সুযোগ তাঁর ছিল না। তিনি শুধু হাতেই বেরিয়ে গেছিলেন, আর রঞ্জা দেবীকে বক্স থেকে পরে গিয়ে তাঁর ব্যাগ খুলে খুলে পাউডার দিতেও আমি দেখেছি। তখনও পর্যন্ত ব্যাগ বদল হয়নি।

ব্যাগটা বদল হয়েছে বলেই তাহলে তুমি ধরে নিচ্ছ! পরাশরের মুখের হাসিটা একটু যেন বাঁকা ঠেকল, গলার স্বরটাও।

হাতের ঢাকা সরিয়ে এবার মুখ তুলল রঞ্জা। কাতরতার বদলে চোখে তার এখন একটা হতাশ ঔদাসীন্য।

ধরে নেওয়াটা তোমার বন্ধুর অন্যায় হয়েছে এই তো তুমি বলতে

চাও—ক্লান্ত গলায় বললে রঞ্জা, বেশ তাই ধরে নাও। কিন্তু এখন আমায় নিয়ে যাচ্ছ কোথায়, লালবাজার তো এত দূর নয়।

লালবাজারে এখনো যাইনি। একটু অবাকই হতে হল পরাশরের কথায়—তোমার আর কৃত্তিবাসের কথা শোনবার জন্যে গাড়িটা নিয়ে গড়ের মাঠেই চক্কর দিচ্ছি।

শোনা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার একটা অনুরোধ রাখবে? রঞ্জা শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, লালবাজার যাবার আগে, যেখানেই যাক চৌহানকে আমায় একবার দেখতে দেবে? সে কি বেঁচে আছে এখনো!

রঞ্জার গলার স্বরটা প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল শেষ কথাটা বলতে গিয়ে।

পরাশরের উত্তর দিতে তাই বোধ হয় দেরী হল, একটু নীরবে খানিকক্ষণ রঞ্জার দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

তাহলে আমায় তাকে শেষ দেখা একবার দেখতে দাও। তারপর নিয়ে যেও যেখানে চাও। এতক্ষণের সংযমের বাঁধ ভেঙে আবার আকুল হয়ে উঠল রঞ্জার কণ্ঠ।

অত্যন্ত দুঃখিত রঞ্জা! যেন নিরুপায় হয়ে বললে পরাশর, চৌহানের কাছে এখন তোমায় নিয়ে যেতে পারছি না। লালবাজারে ওঁরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

*　　*　　*　　*

চৌহানের কাছে নিয়ে যেতে চায়নি পরাশর, কিন্তু তার সঙ্গেই প্রথম দেখা হল মিনিট দশেক বাদে।

শুধু চৌহান নয়, বৃজলালজী এবং আরো একটি মহিলা। ভদ্র-মহিলাকে বেশ চেনা চেনাই লাগল গোড়া থেকে। নামটা শোনবার পর স্মৃতিটা আর ঝাপসা রইল না। নামটা লালবাজারের একটি কামরাতেই যাবার পর শুনলাম। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কি মেজ কি সেজ জানি না, ওপরওয়ালাই কেউ হবেন। ডাকতে শুনলাম মিঃ লাহিড়ী বলে পরাশরকে। সেই লাহিড়ীরই একটি ভেতর দিকের নিরিবিলি ঘর লালবাজারে।

সেখানেই একজন সার্জেন্ট পরাশরের সঙ্গে আমাদের পথ দেখিয়ে

নিয়ে যাবার পর রঞ্জার মত আমিও অবাক।

ঘরটা অফিস অফিস চেহারাই নয়, কোতোয়ালী গন্ধও কোথাও নেই। সোফা কৌচ পাতা মাঝারি আকারের একটা যেন বসবার কামরা। সেখানে পোশাক থেকেই একজনকে পুলিশের বড় অফিসার বলে বোঝা গেল। নামটা শুনলাম লাহিড়ী। লাহিড়ী ছাড়া আর যে তিনজন সেখানে বসে, তাদের সেখানে দেখবার কথা কল্পনা করিনি। রঞ্জা তো নয়ই।

মহিলা বাদে তিনজনের একজন বৃজলালজী, দ্বিতীয়জন স্বয়ং চৌহান।

চৌহান! ঘরে ঢুকেই রঞ্জা কৌশল নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে যে চিৎকারটা করে উঠল সেটা চাপা উত্তেজনায় এমন তীব্র, যে তা বিস্ময়ের না আতঙ্কের স্পষ্ট করে বলতে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে।

চৌহানও তখন দাঁড়িয়ে উঠেছে, একটু হেসে বললে, ইয়ে, এখনো বেঁচে আছি অক্ষত শরীরে। কিন্তু তুমি এখানে কেন?

আমি......আমাকে এরা ......রঞ্জা এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না।

পরাশরই তাকে আর আমাকে সামনের দুটি কৌচে বসতে বলে যেন তার বক্তব্যটা সম্পূর্ণ করলে।

রঞ্জা দেবীকে একটি বিশেষ কারণে এখানে আনা হয়েছে। কেন আনা হয়েছে---বৃজলালজী ও অন্য মহিলাটির দিকে চেয়ে পরাশর বললে, আপনাদেরই বা কেন এখানে ডাকানো হয়েছে, মিঃ লাহিড়ী সবই এবার বুঝিয়ে বলবেন।

লাহিড়ী তাই বললেন। তিনি যা বললেন গাড়িতে পরাশরের কাছে আগেই তার সারাংশ আমরা শুনেছি। লাহিড়ী সবিস্তারে সেই চক্রান্তের কথা যা জানালেন তাতে বোঝা গেল পরাশর এবং আই. বি. বিভাগ বেশ কিছুকাল আগে থেকেই এ ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়েছিল। এই দলের চাঁইদের ধরবার জন্যে শেষ পর্যন্ত একটা ফাঁদই তাই পাতা হয়। চৌহান অবশ্য তাতে স্বেচ্ছায় সাহায্য করে।

চক্রান্তটা ছিল পরাশরের কাছে আগেই যা শুনেছি তাই। ভীমরাজ ঘোড়াটিকে ধরা পড়বার জন্যে সামনে রেখে পিছন থেকে নিজেদের কার্যোদ্ধার করা।

ভীমরাজ ঘোড়াটি নিয়ে কয়েকটা গোলমেলে ঘটনায় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে চৌহান প্রথমে পরাশরকে পরামর্শের জন্য ডাকে। পরাশর তখন থেকেই আই. বি-র সাহায্যে সমস্ত ব্যাপারটার ওপর গোপনে নজরে রাখবার ব্যবস্থা করে, চক্রীদের ধরবার একটা ফন্দি আঁটে।

সে ফন্দির প্রথম চাল হল চক্রীদের মরিয়া করে তোলা। কথায় বার্তায় চৌহান তখন থেকে এই ইঙ্গিত দিতে থাকে যে ভীমরাজ ঘোড়াটার কুলজি সম্বন্ধে তার একটু সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। বাপ মা দুইই তার অজানা বলে রেকর্ডটা কতটা সত্যি তাই অনুসন্ধান করার কথা যেন সে ভাবছে।

চক্রীরা এ সব কথায় প্রমাদ গোনে। তারা বোঝে যে ভীমরাজকে কেন্দ্র করে যে জটিল চক্রান্ত তারা করেছে তার কাজ তাড়াতাড়ি হাসিল না করে তুললেই নয়। আজকের তারিখ ছিল ভীমরাজের দৌড়ের প্রথম দিন। এ তারিখের পর আর অপেক্ষা করতে তাদের ভরসা হল না। তাই কোন রকম বাধা যাতে না আসে তার জন্যে চৌহানকে রেসের আগেই খতম করার ব্যবস্থাও তারা করে। এরকম একটা কিছু হতে পারে অনুমান করে পরাশর এবং আই. বি. আগে থেকেই অবশ্য তৈরি ছিল। চৌহান সকাল থেকে যে ঘরে সাধারণত কাজ করে তার দরজা ভেতর থেকে বন্ধই থাকে, কিন্তু কাঁচের বড় জানলার পাশেই চৌহানের কাজের টেবিল এমনভাবে রাখা যে কাঁচের ভেতর দিয়ে তার চেহারা প্রায় স্পষ্ট দেখা যায়। ঘরের ভেতরে না ঢুকেও কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে থেকে তাকে গুলি করার তাই কোন বাধাই নেই। চৌহানকে সেইভাবেই গুলি করা হয়েছে, শুধু আগের কাঁচটার বদলে তার জায়গায় বুলেট প্রুফ কাঁচ যে বসানো হয়েছে এইটেই খুনী কল্পনা করতে পারেনি......

কিন্তু এসব কথা শোনাবার জন্যে আমায় ডাকা হয়েছে কেন? মিঃ লাহিড়ীর বিবরণের মাঝে হঠাৎ ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল বৃজলালজীর, পুলিশ কি যা খুশি করতে পারে?

না, তা পারে না বৃজলালজী। মিঃ লাহিড়ী শান্ত স্বরে বললেন, শুধু এ চক্রান্তের কয়েকটা জট ছাড়াবার জন্যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে—ভীমরাজের ওপর আপনি কত টাকা খেলেছিলেন?

আমি বলব না। বৃজলালজী প্রায় গণ্ডারের চেহারা নিয়েই বললেন।

না বললেও বুকিদের খাতা থেকে তা আমরা বার করে নিতে পারব বৃজলালজী, পরাশর বললে, আমরা শুধু জানতে চাইছি হঠাৎ ভীমরাজের জন্যে এত ক্ষেপে উঠলেন কেন, আর ভীমরাজ ছাড়া অন্য কোন ঘোড়া খেলেছেন কি না!

অন্য ঘোড়া খেলব! বৃজলালজী এবার বোমার মত ফেটে পড়লেন রাগে আফসোসে, টাউটের কাছে চোরা খবর পেয়ে মাঠে গিয়ে তিনের দর পেলাম, তারপর দর নামতে নামতে যখন 'ইভন্‌স্‌' হয়ে 'অড্‌স্‌ অনে' পেঁছিল তখন খবর খাঁটি মনে করে পাগল হয়ে খেললাম। বিশ হাজার টাকা আমি খেলেছি, জানেন, বিশ হাজার টাকা! তার কত যে কাটা যাবে কে জানে!

বৃজলালজীর শেষ কথাটায় প্রায় আর্তনাদের সুর। সেটা থামতেই অন্য মহিলাটির একটু আদুরে অভিমানের কণ্ঠ শোনা গেল, কিন্তু আমায় কেন ডেকেছেন তা তো বুঝতে পারছি না—

আপনাকে ডেকেছি লীনা দেবী শুধু সাক্ষ্য দেবার জন্যে। বললেন লাহিড়ী।

সাক্ষ্য!! লীনা দেবী হতভম্ব হয়ে সকলের দিকে তাকালেন। তখনই নামটা শুনে আমার সব কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ ঠিক, এই আহ্লাদী চেহারার লীনা দেবীকেই পেমেন্ট নেবার জানালায় আগে টিকিট ভাঙাবার আবদার করতে দেখেছিলাম, পরে দোতলার বারেও রঞ্জার সঙ্গে আলাপ করতে দেখেছি।

কি সাক্ষ্য আমার কাছে চান, লীনা দেবী প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে এবার লতানো ভঙ্গিতেই জিজ্ঞাসা করলেন।

রঞ্জা দেবীর হাতে ওই ব্যাগটা আপনি আজ কোর্সে দেখেছিলেন কি না! বেশ একটু যেন কড়া গলায় পরাশরই সোজাসুজি প্রশ্নটা করলে।

ওই ব্যাগটা! লীনা দেবী কয়েক সেকেন্ডের জন্যে যেন একটু দ্বিধায় পড়ে তারপর উজ্জ্বল মুখে বললেন, হ্যাঁ, ওই ব্যাগটাই তো ছিল রঞ্জার হাতে।

ব্যস্‌, আর কিছু আপনার কাছে জানাবার নেই। আপনি যেতে পারেন লীনা দেবী। আপনিও বৃজলালজী—মিঃ লাহিড়ীই অনুমতি দিলেন।

বৃজলালজী আর লীনা দেবীকে যেতে গিয়েও একটু থামতে হল।

একটু দাঁড়ান লীনা দেবী! মিঃ লাহিড়ীই অনুরোধ জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিজের হ্যান্ডব্যাগটা কোথায়! আপনি কি খালি হাতে মাঠে গিয়েছিলেন নাকি!

আমি!—আমি—লীনা দেবীর মুখটা হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

না না, অত ঘাবড়াবার কিছু নেই, মিঃ লাহিড়ী যেন আশ্বাস দিলেন, হুবহু ঠিক রঞ্জা দেবীর মতই আপনার হ্যান্ডব্যাগটাই তো ওই ওঁর কাছেই রয়েছে। আর বারে কয়েক মিনিট গল্প করবার সময় রঞ্জা দেবীর সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগে তাঁর যে হ্যান্ড-ব্যাগটা বদলে নিয়েছিলেন সেটা সঙ্গে রাখতে সাহস না করে নিচের লেডিজ রুমে ফেলে এসেছেন। সে হ্যান্ডব্যাগও আমরা পেয়েছি। একটু থেমে যেন সুখবর শোনাবার ভঙ্গিতে মিঃ লাহিড়ী বললেন, আপনাকে তাই একটু বসতে হবে লীনা দেবী। আপনার মত দামী লিঙ্ক যখন পেয়েছি তখন আপনার সুতো ধরে আপনাদের সমস্ত গ্যাংটাকেই জালে টেনে তুলতে পারব বলে বিশ্বাস রাখি, বসুন—আপনি বসুন।

আর তুমি এবার যেতে পারো রঞ্জা, অবশ্য তোমার হাতের ওই ব্যাগটাকে রেখে। হেসে এবার বললে পরাশর, মনে হচ্ছে নতুন একটা বাহারী ব্যাগ তোমায় কিনতে হবে, কারণ তোমার যে ব্যাগটা কোর্সের লেডিজ রুমে পাওয়া গেছে, সেটা পুলিশ এখন হাতছাড়া করবে না। আমার মনে হচ্ছে চৌহান নতুন ব্যাগ পছন্দতে তোমায় সাহায্য করতে যেন উদ্‌গ্রীব।

পরাশরের দিকে একটা ঘুসি ছোঁড়ার ভান করে চৌহান রঞ্জাকে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

তারা চলে যাবার পর আমার দিকে ফিরে পরাশর গম্ভীর হয়ে বললে, সামান্য একটা ভার দিয়েছিলাম তাও কিন্তু তুমি সামলাতে পারনি কৃত্তিবাস!

কেন! কেন! আমি রীতিমত ক্ষুব্ধ হলাম।

তোমায় রঞ্জার ওপর নজর রাখতে যে বলেছিলাম সে কি তাকে সন্দেহ করি বলে?—পরাশর এবার হাসতে হাসতে বললে,—তার সঙ্গে কারা ঘেঁসাঘেঁসির চেষ্টা করে তাই জানবার জন্যে। তুমি

বদমেজাজী ও দাম্ভিক বলে বৃজলালজীকে লক্ষ্য করেছ, কিন্তু লীনা দেবী তোমার চোখের ওপরেই যে রঞ্জার ব্যাগটি বদলেছে তা খেয়াল করো নি।

এ কথার আর কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না।

কে বললে ব্যাগ আমি বদলেছি? কি তার প্রমাণ?—লীনা দেবী হিংস্র মুখে যেন আমার হয়ে জবাব দিলেন।